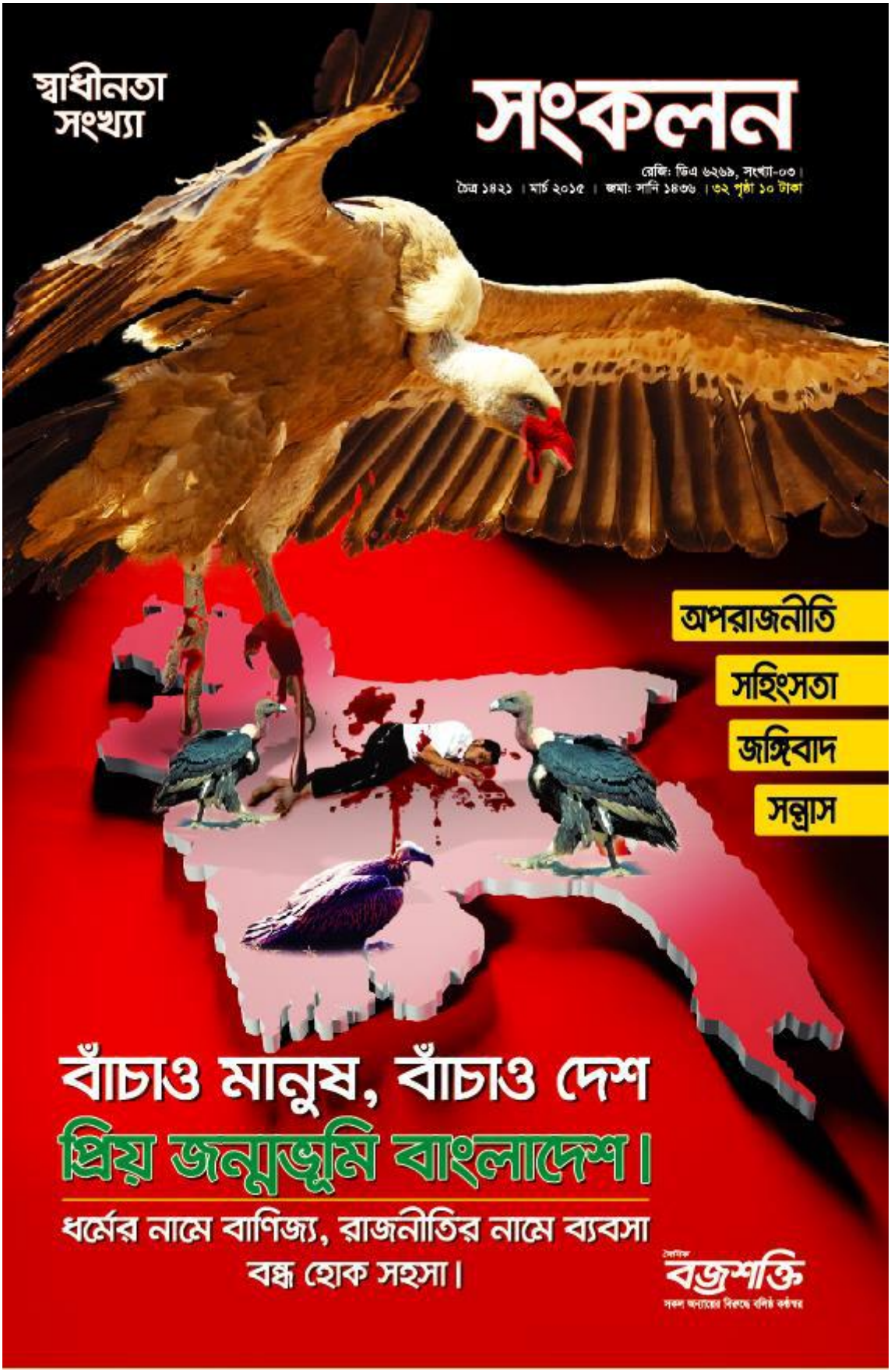
স্বাধীনতা
সংখ্যা
সংকলন
রেজিঃ ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৩।
চৈত্র ১৪২১ । মার্চ ২০১৫ । জমাঃ সানি ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা
অপরাজনীতি
সহিংসতা
জঙ্গিবাদ
সন্ত্রাস
বাঁচাও মানুষ, বাঁচাও দেশ
প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ।
ধর্মের নামে বাণিজ্য, রাজনীতির নামে ব্যবসা
বন্ধ হোক সহসা।
বজ্রশক্তি

সম্পাদকীয়

সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

দুইশত বছর আমরা ব্রিটিশদের অধীন ছিলাম। তারা এ জাতিকে নিয়ে হাজারো ষড়যন্ত্রের খেলা খেলেছে, এ জাতির নৈতিক চরিত্র প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাদের সমুদয় সম্পদ হরণ করে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে হাজারো বিভক্তি, রাজনীতিক বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সৃষ্টিকারী এমন একটা রাজনীতিক ব্যবস্থা (System) চাপিয়ে দিয়ে গেছে যেটা অনুসরণ করে আমরা নিত্য হানাহানি, দাঙ্গা ফাসাদ করে চলছি, আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতীয় ঐক্য দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা চোখের সামনে অপরাধ হতে দেখলেও বাধা দেই না, ভাবি, 'এগুলো দেখার দায়িত্ব তো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। আমি কেন খামাখা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব।' আজকে আমাদের যে জাতীয় সংকট, তা এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার ফল। বর্তমানে আমরা যে সমস্যায় পড়েছি, যে সংকটে পড়েছি তা আমাদের জাতীয় সংকট। এই সংকট নিরসনে অন্তত দু'টি কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সকল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ছুঁড়ে ফেলে সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(এক) এটা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব: মোটামুটি আমরা সবাই আল্লাহ ও রসুলকে বিশ্বাস করি, পরকালকে বিশ্বাস করি, জান্নাতকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাই, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দায়িত্ব সমস্ত রকম সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, অন্যায়, অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষের শান্তিময় নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণা নামায, রোযা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কী? যে গুণ বা বৈশিষ্ট ধারণ করে আমরা সাধারণ একটি প্রাণীর স্তর থেকে মানুষে পরিণত হই তাই আমাদের ধর্ম। সেই গুণগুলি হলো মানবতা, মনুষ্যত্ব, দয়া। ইসলাম কী? ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি, অর্থাৎ মানুষের শান্তির লক্ষ্যে কাজ করাই ইসলামের মূল কাজ, এটাই এবাদত। এই কাজই করে গেছেন আল্লাহর সকল নবী রসুল ও মো'মেনগণ। এই এবাদত না করলে হাশরের দিন আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষকে অশান্তির আগুনে জ্বলতে দেখেও যারা কাপুরুষের মতো ঘরে লুকায় আর এবাদত মনে করে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, নানা উপাসনায় মশগুল থাকে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কাজেই এখন আমাদের প্রত্যেকের এবাদত, ধর্মীয় কর্তব্য, ঈমানী দায়িত্ব হলো এই অশান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করা। তবেই আমাদের অন্যান্য আমল কবুলযোগ্য হবে।

(দুই) সামাজিক কর্তব্য: অনেকে আছেন যারা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বাসগতভাবে প্রস্তুত নয়। তাদের প্রতি আমাদের কথা হলো, মানুষের নিরাপত্তাবিধানের জন্য এগিয়ে আসা এই মুহূর্তে আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। আমরা এই সমাজে বাস করছি, এই সমাজের অস্তিত্ব আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, তাই এই সমাজের প্রতি, এই জাতির প্রতি আমরা আজন্ম ঋণী। আমরা এদেশের আলো বাতাসে, এই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অববাহিকায় বেড়ে উঠেছি। এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়েছি, দেশ ও সমাজের সেই ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। আজকে সমাজের মানুষ যখন অশান্তির মধ্যে আছে তখন তা থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে যদি আমরা হেলাফেলা করি, তাহলে সেটা আত্মঘাতী ভুল হবে। কাজেই ধর্মীয় বা সামাজিক যে দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন, আমরা যদি নিজেদেরকে মানুষ দাবি করি বা এ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি তাহলে বসে থাকতে পারি না, আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল প্রকার অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে, সাধ্যমতো ভূমিকা রাখতে হবে।

আমরা জাতির এই সংকটে এগিয়ে এসেছি। আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি এই সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য। পত্র-পত্রিকা, সংকলন, বই, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লিখে; সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, জনসভা, পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজধানী শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আপামর জনসাধারণকে এই সত্যগুলি জানিয়ে সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, ধর্মব্যবসাসহ সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা এই বিশাল কাজ প্রায় অসম্ভব। এই কাজ আপনাদের। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি মাত্র। আপনারাই পারেন এই কাজের পরিণত রূপ দিতে। তবু যতদিন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অন্যায়-অবিচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত নির্মূল না হবে ততদিন আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশা'ল্লাহ। আমাদের এই সঙ্কলন এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

আমাদের মনে রাখা উচিত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কোনো এবাদতই কবুল হয় না, স্বার্থপর লোকের সমাজে বসবাস করার অধিকার নেই। যে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সে তো পশু, মানবসমাজে তার বসবাসের যোগ্যতা নেই।

সূচিপত্র

- *ধর্মের শিক্ষা সবার রাষ্ট্রও সবার-২*
- *স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা-৩*
- *নারী নেতৃত্ব কি সত্যিই হারাম?-৫*
- *জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা-৯*
- *সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় ইবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান-১২*
- *শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয় কেন-১৪*
- *ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার-১৬*
- *আপনার সন্তানকে নিয়ে একটু ভাবুন-১৮*
- *রাজনীতি ও ধর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জন অশান্তির মূল কারণ-১৯*
- *ব্রিটিশদের তৈরি মাদ্রাসা শিক্ষা-২০*
- *শান্ত-স্নিগ্ধ এদেশ, তাই প্রকৃতি তাদেরকে স্থায়ী হতে দেবে না-২১*
- *জাগ্রত জনতা ও নিদ্রিত জনতা-২১*
- *ইসলামবিদ্বেষীদের রোমান্টিকতা-২২*
- *সম্ভাবনাময় জাতি-২৩*
- *হারিয়ে যেতে বসেছে জাতীয় খেলা কাবাডি-২৪*
- *ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো-২৫*
- *সিরিয়ার পথেই হাঁটছে না তো বাংলাদেশ?-২৭*
- *শান্তি অথবা গণতন্ত্র আমরা কোনটা চাই?-২৮*
- *ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐক্যের গুরুত্ব এবং অনৈক্যের পরিণাম- ৩০*
- *জান্নাতের পূর্বশর্ত কী? তওহীদ নাকি সালাহ?-৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা, ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টাগুলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৬৭৩-৯৯০৪৬৮, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৭৫৩-৯৯৭০০১, ০১১৯১-১০১৩২৪, ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

'ধর্ম ব্যক্তিগত আর রাষ্ট্র সামষ্টিক'- এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে; যখন ইউরোপে একটি বস্তুবাদী সভ্যতা স্থাপিত হয় যার মূলভাব হচ্ছে, "বর্তমানের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির যুগে ধর্ম আর প্রযোজ্য নয়। যারা ব্যক্তিগতভাবে স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে চায়, উপাসনা করতে চায় করুক, কিন্তু ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র চলবে না, রাষ্ট্র চলবে মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে।" এই দর্শনকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে প্রচারমাধ্যম ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মকেই মুছে ফেলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ধর্মকে পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, অন্ধত্ব ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মানুষকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয় নি। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্রষ্টার আত্মা, রূহ আছে (সুরা হিজর ২৯)। মানুষের হাতে আছে ধর্মগ্রন্থ যা স্রষ্টার স্বাক্ষর বহন করছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে স্রষ্টা, প্রভুর নিদর্শন যার সামনে মানুষের মস্তক অবনত হয়। যখনই তারা বিপদাপন্ন হয় তখন প্রতি নিঃশ্বাসে তাদের স্রষ্টা, প্রভুর কাছেই আশ্রয় চায়। ইউরোপীয়রা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসন দিয়েছিল কারণ ঈসা (আ.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেটা ছিল মূলত ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য। জাতীয় জীবন পরিচালনার বিধান তাঁর আনার প্রয়োজন পড়ে নি, কেননা সেটা পূর্বের কেতাব তওরাতেই ছিল এবং তিনি শুধু বনী ইসরায়েলিদের জন্য অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায়কে সঠিক পথনির্দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপে শুধু যিশু খ্রিষ্টের শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছিল। অথচ তাতে দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি না থাকায় ধর্মযাজকরা নিজেরাই নিজেদের মনগড়া বিধি-বিধানকে ঈশ্বরের বিধান বলে চালিয়ে দিতেন। ফলে সমগ্র ইউরোপেই কয়েক শ' বছর ধরে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে স্বার্থ ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ চলেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল, মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হয়েছিল কোটি কোটি মানুষ। উপায়ান্তর না পেয়ে ১৫৩৭ সনে ব্রিটিশ রাজা অষ্টম হেনরির সময়ে, ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ করা হয় এবং রাজা হন রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক। এই রাষ্ট্রনীতি সমগ্র ইউরোপে গৃহীত হয়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিধান আছে, তাই মুসলিমদের ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই। তবুও ইউরোপীয়রা যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো দখল করে নিয়েছিল, সেখানে জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে ছেটে ব্যক্তিজীবনে সীমিত করে ফেলা হলো। আর ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানেও চাপিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহ যাকে দুটো সুস্থ পা দিয়েছেন সে কেন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করবে? তাই ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিগত তিনশো বছরে মুসলিমদের উপর যতই

আমাদের সমাজে একটি শ্লোগান চালু আছে 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। এর উল্টোস্রোতে গিয়ে আমরা বলছি 'ধর্মের শিক্ষাও সবার, রাষ্ট্রও সবার'। কারণ - (১) প্রকৃতপক্ষে সব ধর্ম এসেছে একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে, (২) সকল ধর্মের শিক্ষাও একই অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ সাধন। তাই সকলের স্রষ্টা যেমন এক, সকলের ধর্মও এক। ধর্ম কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য আসে নি। নবী রসুল, অবতারগণ কোনো নির্দিষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, তারা মানবজাতির সম্পদ। তাদের শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থগুলো সকল মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

চাপানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সেটা তাদের সামষ্টিকজীবন ও চিন্তা-চেতনায় সামগ্রিকভাবে গৃহীত হলো না। তাদের মধ্যে সামষ্টিক জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগ্রত থাকল। এখানেই ঘটল বিপত্তি। তাদের সামনে যে ইসলামটি আছে, সেটা আর প্রকৃত রূপে নেই। সেটা বহু আগেই বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে আর শান্তি আসবে না। উপরন্তু সেটা অতিবিশ্লেষণকারী আলেমদের দ্বারা এতটাই জটিল ও দুর্বোধ্য রূপ নিয়েছে যে সেটা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে চলে গেছে। তাই ধর্মীয় বিষয়ে তারা ধর্মব্যবসায়ীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, আর ধর্মব্যবসায়ীরাও মানুষের ঈমানকে ভুল পথে চালিত করে স্বার্থ হাসিল করতে সচেষ্ট হলো। শান্তির ধর্ম হয়ে গেল অশান্তির উৎস।

আমাদেরকে আজ বুঝতে হবে, যে ঈমান দুনিয়াতে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও শান্তির কাজে লাগে না, সে ঈমান আখেরাতেও জান্নাত দিতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ আমাদেরকে দোয়া করতে শিখিয়েছেন, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর, মঙ্গলময় করো এবং আমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর, মঙ্গলময় করো এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো (সুরা বাকারা ২০১)"। বর্তমানে এ জাতির ঈমান, আমল সবই পরকালের সুন্দর জীবনের আশায় অথচ তাদের দুনিয়ার জীবন দুর্দশায় পূর্ণ অর্থাৎ অসুন্দর। কারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা মানবজাতির অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই মানুষের ঈমানকে সঠিক পথে (To right track) পরিচালিত করা গেলে তা জাতির উন্নতি-প্রগতি-সমৃদ্ধির কাজে লাগবে।

আমাদের সমাজে একটি শ্লোগান চালু আছে 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। এর উল্টোস্রোতে গিয়ে আমরা বলছি 'ধর্মের শিক্ষাও সবার, রাষ্ট্রও সবার'। কারণ - (১) প্রকৃতপক্ষে সব ধর্ম এসেছে একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে, (২) সকল ধর্মের শিক্ষাও একই অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ সাধন। তাই সকলের স্রষ্টা যেমন এক, সকলের ধর্মও এক। ধর্ম কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য আসে নি। নবী রসুল, অবতারগণ কোনো নির্দিষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, তারা মানবজাতির সম্পদ। তাদের শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থগুলো সকল মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। মানুষের মধ্যে যারা ধর্মের বিভেদ রেখা টানতে চায় তারা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয়, তারা গোঁড়াপন্থী, তারা ধর্মকে খোঁজে শাস্ত্র-কেতাবের পাতায়। কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকগণ আলোর দিশারি। তারা ধর্ম বলতে শুধু মানবতাকেই বোঝেন, শাস্ত্র-কেতাবের পাতায়ও তারা কেবল মানবতা, শান্তি ও ঐক্যই খুঁজে পান।

লেখক: আমীর, হেযবুত তওহীদ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা

উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী

বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭১ সাল ছিল সর্বাধিক বেদনাদায়ক এবং একইসঙ্গে সর্বাধিক সাফল্যজনক একটি অধ্যায়। বেদনার বিষয় এই কারণে যে, এ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের লাগামহীন অত্যাচার-অবিচার ও জিঘাংসার শিকার হয়ে লাখো বাঙালিকে জীবন হারাতে হয়েছিল, সম্ভ্রম হারিয়েছিল অসংখ্য মা-বোন। বিধ্বস্ত হয়েছিল রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজসহ অসংখ্য স্থাপনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বছরটি বাঙালির জাতীয় পথচলায় স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে অমর হয়ে আছে আমাদের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তৎলব্ধ স্বাধীনতার কারণে। সেই একাত্তর আজও ষোল কোটি বাঙালির প্রাণের প্রেরণায় পরিণত হতে পারে। ঘুণে ধরা এই স্বার্থভিত্তিক সমাজে যখন অপরকে সুখী করতে কেউ স্বশরীরে একটি ফুলের আঁচড় নিতেও রাজি নয়, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির দিকে শকুনের ন্যায় লোলুপ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে, জাতির ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সন্ত্রাসীরা স্বজাতির নিরীহ মানুষগুলোকে আগুন দিয়ে ঝলসে দিচ্ছে, তখন একাত্তরের সেই নিঃস্বার্থ চেতনা বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিপীড়িত, অত্যাচারিত, জনমদুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য রক্তে শিহরণ জাগানো সেই স্লোগান আজ আবারও প্রাসঙ্গিক-

'মোরা একটি মুখের হাসির জন্য যুদ্ধ করি'।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি:

স্বাধীনতা যুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয় নি, ৯ মাসের এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে বহু বছর লেগেছে। শত শত অন্যায়-অবিচারের স্টিম রোলার চলেছে এ জাতির উপরে। পাকিস্তানিরা ক্ষমতালাভের পর থেকেই এ দেশের মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, অপশাসন চালিয়েছে তারই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রচিত হয়েছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে। অন্যায়, অবিচার, যুলুমের বিরুদ্ধে বাঙালির সোচ্চার কণ্ঠের এটি একটি পর্যায়মাত্র। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কেবল ৯ মাস নয়, বহু বছর ধরে চলেছে। সে যুদ্ধ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদেরকে আরও আগে থেকে শুরু করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘ প্রায় আড়াইশ বছর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ

শক্তি আমাদেরকে শোষণ করেছে। এ দেশের সম্পদ পাচার করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, আর আমাদেরকে উপহার দিয়েছে ক্ষুধা-দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ। কোটি কোটি মানুষকে মরতে হয়েছে শুধু ক্ষুধার জ্বালায়। আমাদের মান-সম্মানকে বুটের তলায় পিষ্ট করেছে, আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা বারবার পদদলিত হয়েছে। এরপর যখন ব্রিটিশরা চলে গেল, বলা হলো- তোমরা স্বাধীন। আমরা স্বভাবসুলভ সরল হৃদয়ে সে কথা বিশ্বাস করলাম।

ইসলামের সুমহান আদর্শ- সাম্য, ন্যায়বিচার, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ এই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইসলামী জীবনাদর্শ উপহার দেওয়ার কথা বলে ভারত থেকে স্বাধীন জাতিসত্ত্বা নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি দেশ গঠন করা হলো। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলমান। তারা এক আল্লাহকে সেজদাহ করে, একই দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ে। তারা এমন নবীর উম্মত যাঁর স্পষ্ট নির্দেশ- মুসলমান ভাই ভাই, মুসলমানের রক্ত ও মান-মর্যাদা একে অপরের জন্য হারাম (পবিত্র)। কাজেই ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূ-খণ্ডের ফারাক ধর্মের মেলবন্ধনকে ছিন্ন করতে পারবে না এমনটাই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে হলো ঠিক উল্টোটা। একই ধর্মের মানুষ হিসেবে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করার যে আশা করা হয়েছিল তা উবে গেল অল্প দিনেই। প্রতারক, স্বার্থবাজ, পাকিস্তানের নেতারা অচিরেই ভুলে গেল আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদার কথা। পাকিস্তানি শাসকরা মুখে মুখে ধর্মকে আলিঙ্গন করে রাখলেও, অল্প দিনেই কার্যত ধর্মের শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে মেকি লেবাস পড়ে ঘোর অধর্মের ডাল-পালা বিস্তার করল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক- সকল দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পদে পদে বঞ্চিত করা শুরু হলো। ব্রিটিশ শোষকদের প্রেতাত্মা ভর করল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপর। ঔদ্ধত্য তাদেরকে এতটাই অন্ধ করে দিল যে, এ দেশের শত বছরের নির্যাতিত, নিপীড়িত সহজ-সরল মানুষের বুকে গুলি চালাতেও তারা দ্বিধা করল না। ভাষার জন্য, ভোটের অধিকারের জন্য, সর্বপোরি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার বাঙালির রক্ত ঝরতে লাগল। এরই ধারাবাহিকতায় রচিত হলো ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট। যখনই পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ দেশের নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ছক এঁকেছে, এ দেশের কোটি কোটি মানুষ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফলে পাকিস্তানি শোষকরা ব্যর্থতার গ্লানিতে জ্বলে অস্ত্রের ভাষায় নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে। সারা বিশ্ব দেখেছে- বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে শোষকদের প্রতিটি বুলেটকে হজম করেছে, কিন্তু পিছপা হয় নি। ঐক্যের শক্তির বারবার পরাজিত করেছে অস্ত্রের শক্তিকে, এমনকি পরাজিত করেছে ১৯৭১ সালেও।

স্বাধীনতার চেতনা মানে কি ধর্মহীনতা?

একাত্তরে এই জাতির সংগ্রাম ছিল অন্যায়, অবিচার, অনাচার, যুলুম, নির্যাতন তথা অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কোটি কোটি নিরীহ ও শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সংগ্রাম। সেই সাথে সেটা ছিল ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের সকল অপকর্মকে জায়েজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ দেশের মানুষ ধর্মান্ধের মতো তাদের অন্যায় মেনে নেয় নি। কোনটা ধর্ম, কোনটা ধর্মব্যবসা- বাংলার লাখো কোটি জনতা তা ভালোভাবেই বুঝেছিল। তাই এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ধর্মব্যবসায়ীরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়। অর্থাৎ একাত্তরের চেতনা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো- আজ অনেকেই একাত্তরের চেতনা বলতে ধর্মহীনতা বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। অথচ বাস্তবতা হলো– ধর্মহীনতা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার চিন্তা-চেতনা, ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামবিদ্বেষী, ধর্মবিদ্বেষী কিছু লেখক-সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার প্রচারণা এবং ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের সামনে থেকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা কার্যত উধাও হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে কৌশলে দেশপ্রেমিক তরুণদের মধ্যে ধর্মহীনতার বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চলছে।

আমরা সকলেই জানি- মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মুক্তির লক্ষ্যে। কী থেকে মুক্তি? যে কোনো অন্যায়, অসত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, তা সামাজিক হোক, রাজনৈতিক হোক বা ধর্মীয় হোক। একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী দুর্নীতি করলে তার দায়ভার যেমন ওই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নেবে না, ওই দুর্নীতিবাজ কর্মচারীকে নিতে হবে, তেমনই ধর্মের দোহাই দিয়ে যদি কেউ অপকর্ম করে তার দায়ভারও ধর্ম নেবে না, এর জন্য দায়ী করতে হবে ওই ধর্মব্যবসায়ীদেরকে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যুগে যুগে ধর্মই মানুষকে অসত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি নিজেদের ধর্মহীন দল হিসেবে প্রচার করতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো পরের কথা, শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হতো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একইভাবে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ধর্মহীনতার চেতনা নিয়ে যুদ্ধ করেছে- এমন ধারণাও নিতান্তই অর্বাচীনসুলভ। বরং একাত্তরের চেতনা হলো সকল অন্যায়-অবিচার আর অধর্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা। কোন অপশক্তির কাছে মাথানত না করার চেতনা। কাজেই একাত্তরের চেতনার সাথে ধর্মহীনতাকে জুড়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস থেকে সকলের বের হয়ে আসা উচিত।

লেখক: উপদেষ্টা, দৈনিক বজ্রশক্তি।

নারী দিবসের ভাবনাঃ রুফায়দাহ পন্নী

নারী নেতৃত্ব কি সত্যিই হারাম?

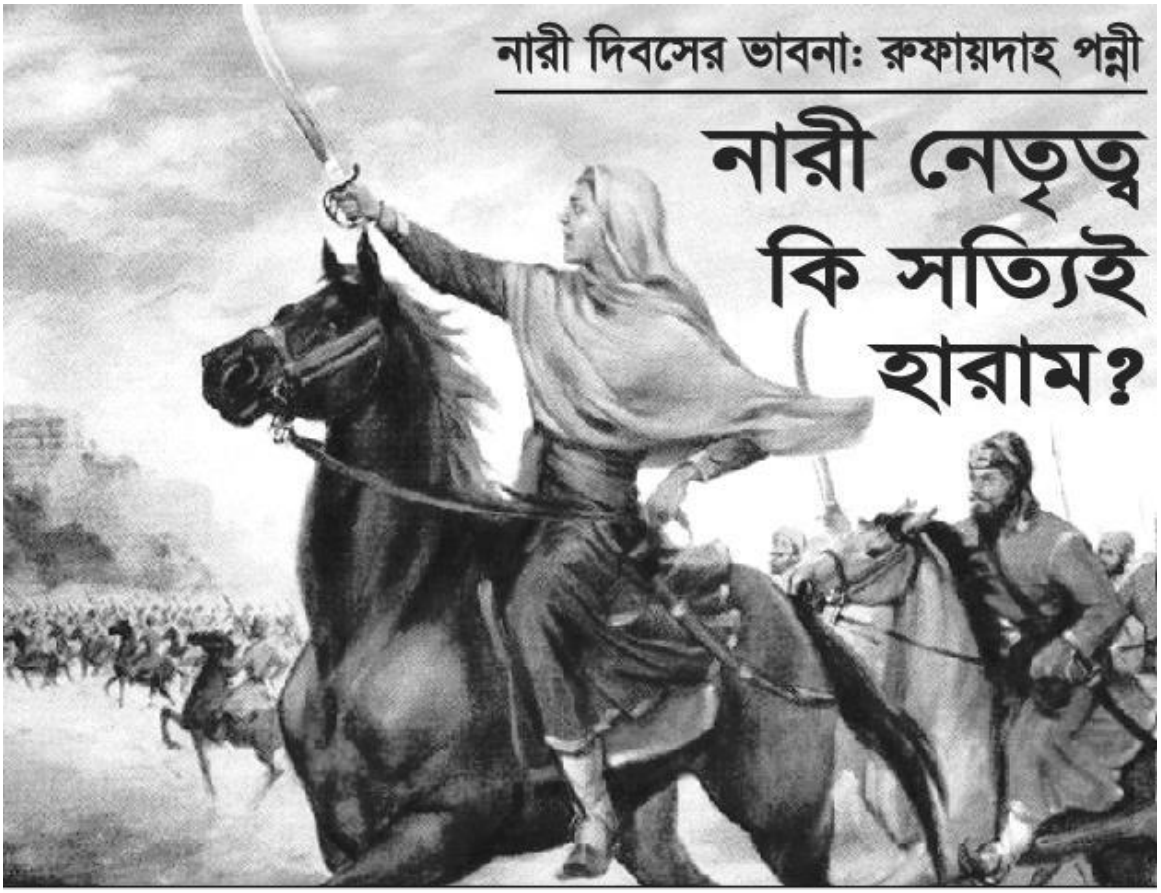

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার আগে দু'টি পূর্বসিদ্ধান্ত-

(১) পারিবারিক জীবনের বিধানে রাষ্ট্র চলে না, উভয় অঙ্গনে আলাদা বিধান লাগবে।

মানবজাতিকে আল্লাহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই মানুষের মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু'টি সৃষ্টি- নারী ও পুরুষ। শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠনে এদের উভয়েরই স্রষ্টা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেই দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করেই মানবসমাজ যাত্রা শুরু করে। যে বিধান একটি পরিবারের জন্য প্রযোজ্য তা দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে না, আবার রাষ্ট্রীয় একটি আইন পরিবারের মধ্যে প্রয়োগ করাও অযৌক্তিক হতে পারে। এই উভয় অঙ্গনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাগুলো আল্লাহ তাঁর প্রেরিতদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানবজাতিকে দান করেছেন।

(২) ভারসাম্য আল্লাহর বিধানের একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে ধর্ম অধর্মে পরিণত হয়।

আত্মিক চরিত্র ও জাগতিক বিধান উভয়ের বিস্ময়কর সমন্বয়ে গঠিত এই সনাতন, শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। মানবসমাজের এই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ইবলিস প্ররোচনা দিয়ে এই দীনের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। ফলে মানুষ ভুলে গেছে কার কি কর্তব্য ও স্রষ্টা নির্ধারিত দায়িত্ব। দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। তাই অন্যায় অবিচারে ডুবে গেছে মানুষ। আল্লাহ আবার কোন নবী রসুল পাঠিয়ে সেই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। এভাবেই মানবজাতি লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে, একটার পর একটা যুগ অতিক্রম করে শেষ যুগে এসে উপনীত হয়েছে। বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (দাজ্জাল) মানুষের জীবন থেকে সর্বপ্রকার নৈতিকতার শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং স্রষ্টা ও আখেরাতের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নারী ও পুরুষের কার কী অবস্থান, কার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য তা মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে। সকল ধর্ম বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে এ বিষয়ে স্রষ্টার দেওয়া মানদণ্ডও দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে।

প্রচলিত বিকৃত ইসলামে নারী পুরুষের সঠিক অবস্থান নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সকল আলেমই "সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত"কে ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপন করেন।

"আর-রেজালু কাওয়্যামুনা আলান্নেসায়ী"- ইসলামবিদ্বেষীরা এ আয়াতটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এ আয়াতটির অনুবাদ করা হয়, "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।" [সুরা নিসাঃ ৩৪]

ইসলামকে পশ্চাদপদ, নারীবিদ্বেষী মতবাদ, ইসলাম

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করতে চায় ইত্যাদি পশ্চিমা গৎ বর্ণনা করতে করতে নারীবাদীরা মাইক্রোফোন সিক্ত করে ফেলেন, তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে এই আয়াতের উল্লেখ করেন। অপরদিকে কূপমণ্ডূক, খ্রিষ্টানদের শেখানো বিকৃত ইসলামের ধ্বজাধারী আলেম মোল্লারা নারী-ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করতেও আশ্রয় নেয় এই আয়াতটির। আসুন আমরা এই শতবর্ষী বিতর্কের একটি বিরাম চিহ্ন টানি।

আমরা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যে কাজের দায়িত্ব দেই, একজন শিশুকে তা দেই না। কারণ তাদের শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা ও সক্ষমতার তারতম্য। তারা উভয়েই একই পরিবারে থাকে কিন্তু উভয়ের কাজের ক্ষেত্র আলাদা। পরিবার হচ্ছে মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। এই আয়াতে ইসলামে নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারে কার কী অবস্থান, অধিকার ও কর্তব্য সে সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কোন ভোগ্যবস্তু নয়, দাসীও নয়। এই আয়াতে আল্লাহ পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন 'কাওয়্যামুনা'। শাসক, কর্তৃত্বের অধিকারী, আদেশদাতা, ক্ষমতাশালী, নেতৃত্বের অধিকারী, Authority Power ইত্যাদি বোঝাতে আরবিতে আমীর, সাইয়্যেদ, এমাম, সুলতান, হাকীম, মালিক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখন আসুন দেখি আল্লাহ এসব কোন শব্দ ব্যবহার না করে 'পুরুষ নারীর কর্তা' বোঝানোর জন্য আল্লাহ 'কাওয়্যামুনা' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন। আল্লাহ কোন যুক্তিতে এবং কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল করেছেন তা এর অর্থের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কাউয়ামুনা শব্দের অর্থ হচ্ছে সুঠাম ও সুডৌল দেহবিশিষ্ট, মানুষের গঠন কাঠামো, ঠেক্না, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, শাসক, নেতা (আরবি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ ৫৩১- ই.ফা.বা.)। সুতরাং এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, পুরুষ শারীরিক দিক থেকে নারীর চেয়ে শক্তিশালী, তার পেশী, বাহু, হাড়ের গঠন, মেরুদণ্ড এক কথায় তার দেহকাঠামো নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমের উপযোগী, আল্লাহই তাকে রুক্ষ পরিবেশে কাজ করে উপার্জন করার সামর্থ্য বেশি দান করেছেন, তাই পুরুষের দায়িত্ব হলো সে পুরুষ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে, কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলিয়ে, শিল্পকারখানায় কাজ করে উপার্জন করবে এবং পরিবারের ভরণপোষণ করবে। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে আল্লাহ নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীর অভিভাবক করেছেন। এটা মানব সমাজে বিশেষ করে পরিবারে পুরুষের বুনিয়াদি দায়িত্ব। অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ সন্তান ধারণের উপযোগী শরীর দান করেছেন, সন্তানবাৎসল্য ও সেবাপরায়নতা দান করেছেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের মূল কাজ হচ্ছে সন্তানধারণ করা, তাদের লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা এক কথায় গৃহকর্ম করা। পবিত্র তওরাতেও নারী ও পুরুষের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যা পবিত্র কোর'আনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে স্বামী শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক। আল্লাহর একটি সিফত হচ্ছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ যেমন কোন প্রাণী সৃষ্টি করার আগেই তার রেজেকের বন্দোবস্ত করে রাখেন, কেবল আহার্য নয় জীবনোপকরণ হিসাবে তার যখন যা দরকার তাই তিনি নিরন্তর সরবরাহ করে যান। বিশ্বজগতে প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর যে ভূমিকা, একটি পরিবারে আল্লাহরই প্রতিভূ (খলিফা) হিসাবে পুরুষেরও অনেকটা সেই ভূমিকা, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে।

সংসার ও বাস্তব সমরাঙ্গণে পুরুষ প্রথম সারি, নারী দ্বিতীয় সারি

সালাহ হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটির মডেল। এখানে প্রথম সারিতে পুরুষ এবং দ্বিতীয় সারিতে নারী। বাস্তব জীবনেও এই মডেলের রূপায়ণ ঘটা ইসলামের কাম্য। উপার্জন করা পুরুষের কাজ, তাই বলা যায় জীবিকার অঙ্গনে মেয়েরা দ্বিতীয় সারির সৈনিক। কখনও কখনও যদি অবস্থার প্রয়োজনে নারীকে প্রথম সারিতে গিয়ে জীবিকার লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয় সেটার সুযোগ আল্লাহ রেখেছেন। শোয়াইব (আ.) বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁর পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর দুই তরুণী কন্যা তাঁদের পশুপালের দেখাশোনা করতেন (সুরা কাসাস ২৩)। এছাড়া ইসলামের বিধান হলো স্বামীর উপার্জনের উপর স্ত্রীর অধিকার রয়েছে কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনের উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। এখানেও নারীর উপার্জন করার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া হলো। রসুলাল্লাহর অনেক নারী আসহাব পরিবারে পুরুষ সদস্য না থাকায় বা পুরুষ সদস্যরা জেহাদে অধিক ব্যস্ত থাকায় নিজেরাই কৃষিকাজ করে, কুটির শিল্পের মাধ্যমে উপার্জন করতেন, অনেকে ব্যবসাও করতেন। রসুলাল্লাহর আহ্বানে সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি একজন নারী, আম্মা খাদিজা (রা.)। তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়, মানবতার কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শিয়াবে আবু তালেবের বন্দীদশার তিন বছরে তিনি তাঁর ব্যবসার যাবতীয় পুঁজি পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছিলেন। এ সময়ে খাদ্যাভাবের দরুন তিনি অত্যন্ত রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তাঁর ইন্তেকালের কারণ ছিল অপুষ্টিজনিত অসুস্থতা। আবার ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যিনি জীবন দিলেন, শহীদ হলেন তিনি একজন নারী, সুমাইয়া (রা.)।

এবার আসা যাক সত্যিকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে। অন্যায়ের বিরুদ্ধের সংগ্রাম করার জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি। যে সংগ্রামমুখী নয় সে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রাথমিক সদস্য হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রথম সারিতে (Front Line) থেকে

সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দায়িত্ব পুরুষদের। এখানেও কারণ পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। জেহাদে নারীর স্বাভাবিক অবস্থান দ্বিতীয় সারিতে।

দ্বিতীয় সারির কাজের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে রসদ সরবরাহ। যুদ্ধের বেলাতে রসদ সরবরাহকে যুদ্ধের অর্ধেক বলে ধরা হয়। সৈনিকদের খাদ্য, পানি, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক উপাদান সরবরাহ, আহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া, নিহতদেরকে দাফন করা ইত্যাদি সবই দ্বিতীয় সারির কাজ। রসুলাল্লাহর সময় নারীরা প্রায় সকল যুদ্ধেই প্রথমে এই দ্বিতীয় সারির দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, নিহতদের দাফনে সহায়তা করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদেরকে পানি পান করিয়েছেন। তাছাড়া মসজিদে নববীর এক পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার প্রধান ছিলেন একজন নারী রুফায়দাহ (রা.)। যোদ্ধাদেরকে যদি রসদ ও এই সেবাগুলো দিয়ে সাহায্য না করা হয় তবে তারা কখনোই যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই যে কোন সামরিক বাহিনীতে এই দ্বিতীয় লাইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় সারির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, প্রথম সারিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। যে কোনো যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো সৈনিকদের আত্মপ্রত্যয়, মনোবল (Morale)। মনোবল না থাকলে সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় সারির বড় দায়িত্ব সৈন্যদের এই মনোবল বৃদ্ধি করা। আমরা আম্মা খাদিজার (রা.) কথা যদি বলি, দেখব যখন আল্লাহর রসুল নব্যুয়তের দায়িত্ব পেলেন, তিনি সারাদিন মানুষের কাছে সত্যের বাণী প্রচার করে সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তেন। সেই ক্লান্ত শ্রান্ত রসুলাল্লাহকে অনুপ্রেরণা দিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন আম্মা খাদিজা (রা.)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ককে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়ে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে নারী তাঁর অবদানকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। রোমান বাহিনীর প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মুসলিম বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহীরা যখন ধীরে ধীরে পিছু হটে নিজেদের ক্যাম্পের কাছে চলে এসেছিলেন সেখানে তারা পেছন থেকে আক্রমণের শিকার হন। না, রোমান বাহিনী নয়, তাদেরকে পেছন থেকে তাঁবুর খুঁটি আর পাথর দিয়ে আক্রমণ করে বসে মুসলিম নারীরা। তারা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "যারা শত্রুর নিকট হতে পলায়ন করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজেল হোক।" এবং তারা স্বামীদের প্রতি চিৎকার করে বলেন, "তোমরা যদি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারো তাহলে তোমরা আমাদের স্বামী নও।" সারিবদ্ধ অন্য নারীরা ড্রাম বাজিয়ে রণসঙ্গীত গাইতে থাকেন। নারীদের দ্বারা এভাবে অপমানিত হয়ে পুরুষ যোদ্ধারা পুনরায় ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেন।

কিন্তু মেয়েরা কি সবসময় কেবল দ্বিতীয় লাইনেই থাকবেন? না। যুদ্ধে এমন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন মেয়েদেরকেও অস্ত্র হাতে নিতে হয়, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়। ওহুদের যুদ্ধে যখন মোসলেম বাহিনী বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, বহু সাহাবী শহীদ হয়ে যান, স্বয়ং রসুলাল্লাহ মারাত্মকভাবে আহত হন, কাফেররা প্রচার করে দেয় যে, রসুলাল্লাহও শহীদ হয়ে গেছেন এমনই বিপজ্জনক মুহূর্তে মেয়েরা আর দ্বিতীয় সারিতে থাকলেন না, তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে রসুলাল্লাহকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাফের সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবী উম্মে আম্মারার (রা.) অবিশ্বাস্য বীরত্ব সম্পর্কে রসুলাল্লাহ বলেছিলেন, 'ওহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আম্মারাকেই লড়াই করতে দেখেছি।'

ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীর যোদ্ধা দেরার বিন আজওয়ার যখন শত্রুর হাতে আটকা পড়েন তখন তারই বোন খাওলা ঘোড়ায় চড়ে এমন লড়াই শুরু করে ভাইকে উদ্ধার করেন যে স্বয়ং খালিদ (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করেন। সত্যপ্রিয় পাঠকের বোঝার জন্য এ উদাহরণ দু'টিই যথেষ্ট যে, রসুলাল্লাহর সময়ে নারীরা প্রথম সারির ভূমিকাও কিভাবে পালন করেছেন। মাসলা মাসায়েলের জটিল জাল বিস্তার করে কোনো কাজেই তাদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা হয় নি, আজ যেমনটা করা হচ্ছে। নারীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাকে ইসলাম মোটেও অস্বীকার করে না। যদি অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন নারীকে দ্বিতীয় সারি থেকে প্রথম সারিতে আসতে হয় এবং সেখানে তিনি যদি তার জ্ঞান, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ্যবলে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি বহু পুরুষের উপরও নেত্রী হিসাবে নিয়োজিত হতে পারবেন। উটের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা (রা.)। বহু সাহাবী তাঁর অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন কিন্তু "ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম" বলে তখন তাঁর পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধরত কোন সাহাবী ফতোয়া দিয়েছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর বিধান মতে কেবল একটি মাত্র পদ নারীকে দেওয়া বৈধ নয়, সেটি হলো- উম্মতে মোহাম্মদী নামক মহাজাতির এমামের পদ। আল্লাহ নারী ও পুরুষের দেহ ও আত্মার স্রষ্টা, সচেতন মন ও অবচেতন মনের স্রষ্টা। এদের উভয়ের দুর্বলতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন মহান আল্লাহ। তিনি জানেন যে নারীর শারীরিক গঠন যেমন পুরুষের তুলনায় কোমল, তার হৃদয়ও পুরুষের তুলনায় কোমল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল। সহজেই তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, তার স্থৈর্য্য, দূরদর্শীতা পুরুষের চেয়ে কম, তাকে প্রভাবিত করা সহজতর। ইবলিস নারীকেই প্রথম আল্লাহর হুকুম থেকে বিচলিত

করেছিল। এ কারণেই আল্লাহর অসংখ্য নবী-রসুলের মধ্যে একজনও নারী নেই। পারস্যের সঙ্গে রোমের যুদ্ধের সময় রসুলাল্লাহ একটি পূর্বাভাসে বলেছিলেন, নারীর হাতে যে জাতি তার শাসনভার অর্পণ করেছে সে কখনো সফল হতে পারে না (তিরমিজি)। সুতরাং পৃথিবীময় উম্মতে মোহাম্মদী নামক যে মহাজাতি হবে সেই মহাজাতির এমাম কেবল নারী হতে পারবেন না, স্বীয় যোগ্যতাবলে অন্যান্য যে কোন পর্যায়ের আমীর বা নেতা সে হতে পারবে। শুধু নারী হওয়ার কারণে কেউ নেতৃত্ব দিতে পারবে না এটা ইসলামের দৃষ্টিতে যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপকাঠি নয়।

পারিবারিক বিধানকে জাতীয়করণ করতে চায় বিকৃত ইসলামের আলেমরা

পুরুষ যেহেতু পরিবারের সবাইকে ভরন-পোষণ করাচ্ছে, লালন-পালন করছে কাজেই তার কথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে শুনতে হবে, এটা একটি পারিবারিক শৃঙ্খলা। কিন্তু পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত এই আয়াতটিকে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন ধর্মজীবী আলেম সমাজ। তাদের এই অপচেষ্টার ফলে নারী সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে না, তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণও দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আজকের বিকৃত ইসলামের কূপমণ্ডূক ধর্মজীবী আলেম-মোল্লারা সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত উল্লেখ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। তারা এটা বুঝতে সক্ষম নন যে, একটি পরিবার পরিচালনার শৃঙ্খলা দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে না, বা জীবনের অন্যান্য অঙ্গনগুলো চলতে পারে না। জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে যার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বেশি সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তাকেই নেতা মনোনীত করা যাবে। সেখানে পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলাকে টেনে এনে অযোগ্য পুরুষকে নারীর কর্তা করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে এক হাজার জন কর্মকর্তা, কর্মচারী আছে। সেখানে যদি জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতায় কোন নারী অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে সেখানে সেই নারীকে প্রধান অর্থাৎ নেতৃত্বদানকারী হিসাবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? সেই হিসাবে একজন নারী কোন এলাকার রাজনৈতিক প্রশাসকও (Governor) হতে পারেন। আজকের বিকৃত ইসলামের ধ্বজাধারীরা ইসলামে পুরুষ ও নারীর অবস্থানকে এমনভাবে ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে যে তারা নতমস্তক নারীদের গায়ে বোরকা চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের গৃহবন্দি করেছে, অপরদিকে পুরুষকে দিয়েছে স্বৈরশাসকের অধিকার। তথাকথিত প্রগতিশীলরাও মোল্লা শ্রেণির এইসব মুর্খতাকে অসার প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ-রসুলকেই দোষারোপ করছে। তারা নিজেরাও পাশ্চাত্য জড়বাদী 'সভ্যতা'র শিক্ষায় অন্ধ হয়ে আছেন। নইলে তারা বুঝতে পারতেন যে, এই ধর্মজীবী আলেম মোল্লারা আল্লাহ রসুলের ইসলামের কেউ নয়, বরং তাদের কাজের দ্বারা ইসলামে সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

লেখক: হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র মেয়ে, দৈনিক বজ্রশক্তির উপদেষ্টা ও দৈনিক দেশেরপত্রের সাবেক সম্পাদক।

রসুল (স:) এর দরবার ছিল নারীদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। রসুলের (স:) সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদের সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা

ফাহমিদা পান্না

যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। প্রকৃত ইসলাম নারীকে দিয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতা। কিন্তু এই সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় বিধিবিধানের নামে নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। সেই অচলায়তন ভেঙ্গে নারী এককভাবে পুরুষের পাশাপাশি সাহসী ভূমিকা পলন করছে হেযবুত তওহীদের নারীরা। এই নিবন্ধে তাই তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

রসুলাল্লাহর সময় নারীরা কেমন ছিলেন?

রসুলাল্লাহর সময় নারীরা মহানবীর সামনা সামনি বসে আলোচনা শুনতেন, শিক্ষাগ্রহণ করতেন, মহানবীকে প্রশ্ন করে জরুরি বিষয় জেনে নিতেন, অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও দিতেন। এ সময় রসুলাল্লাহ ও মেয়েদের মাঝে কোনো কাপড় টাঙ্গানো ছিল এই ব্যাপারে কেউ কোনো দলিল দেখাতে পারবে না। নারীরা মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে, জুমা'র সালাতে, দুই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন। তারা পুরুষের সঙ্গেই হজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, যেটা এখনও চালু আছে; তারা কৃষিকাজে, শিল্পকার্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত কাজ তারা ইসলামের নির্দেশিত হেজাবের সাথেই করতেন। এমনকি রসুলাল্লাহর নারী সাহাবীরা পুরুষ সাহাবীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে সমানতালে অংশগ্রহণ করেছেন। মসজিদে নববীর এক পাশে তৈরি করা হয়েছিল যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই বিশেষ চিকিৎসা ইউনিটে অধ্যক্ষ ছিলেন একজন নারী। অথচ আজ বিকৃত অতি পরহেজগার নারীদের এই ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই। বর্তমান ইসলামে যে নারী যত আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে গৃহ-অভ্যন্তরে অবস্থান করবেন তিনি তত বড় পরহেজগার হিসেবে গণ্য হন।

হেযবুত তওহীদের নারীদের কর্মকাণ্ড:

হেযবুত তওহীদের মেয়েরা আন্দোলনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এমামুয্‌যামান সব সময় চেষ্টা করেছেন পুরুষদের পাশাপাশি যেন মেয়েরাও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। নারীরা মহানবীর সঙ্গে থেকে বিস্ময়কর বিপ্লব সম্পাদনে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা এমামুয্‌যামান হেযবুত তওহীদের মোজাহেদাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হেযবুত তওহীদের মেয়েরা শহরে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। মেলায়, মার্কেটে গিয়ে বই বিক্রি করেছেন, হ্যান্ডবিল বিতরণ করেছেন। তওহীদের বালাগ দিতে গিয়ে পুরুষদের সাথে অনেক মেয়েও হাসিমুখে জেল, জুলুম, ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামাদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন, ঘরবাড়ি

থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, নিজের ঘরবাড়ি ও পরিবার থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। অনেকে স্বামী, সন্তান, সংসার পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, যেটা মহানবীর অনেক নারী সাহাবীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য, মানবজীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে অনেক মেয়ে কঠিন সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ বরণ করে নিয়েছেন।

উপার্জনে মেয়েরা:

পুরুষরা ব্যস্ত ১৬ কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। দিন নেই, রাত নেই কেবলই সংগ্রাম, সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বেসাতি ধ্বংসের সংগ্রাম। কিন্তু পরিবার চলবে কী করে? উপার্জন করবে কে? বেঁচে থাকতে হবে তো। কিছু উপায়-উপার্জন তো করতেই হবে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এই উপার্জনের দায়িত্ব তখন কাঁধে তুলে নিয়েছেন হেযবুত তওহীদের নারীরা। পিঠা বিক্রি করে, দোকানে দোকানে, রাস্তা-ঘাটে, বাড়িতে বাড়িতে বই-পুস্তক বিক্রি করে, খেলনা বিক্রি করে, পত্রিকা-ম্যাগাজিন বিক্রি করে হলেও আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত স্বামী-সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন তারা। আল্লাহর রহমে অনেক সদস্যা পরিবারের খরচ যোগানোর পর তার নিজের উপার্জন থেকে আন্দোলনের ফান্ডেও অর্থপ্রদান করে সত্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। ধর্মীয় কুসংস্কারসহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের সমাজে এখনও নারীদের আয়-উপার্জনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিশেষ করে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি বাড়ির বাইরে গিয়ে নারীদের উপার্জনের বিরোধিতায় লিপ্ত। ধর্মের লেবাসধারী এই অধার্মিকরা, জাতির অর্ধেক নারীকে কার্যত অক্ষম করে রাখতে চায়। তাই হেযবুত তওহীদের নারীদের জন্য কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। অনেক স্থানেই ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত কার্যত ধর্মান্ধরা, হেযবুত তওহীদের নারীদেরকে নিয়ে কটূক্তি করেছে, এমনকি গালাগাল পর্যন্ত করেছে। কিন্তু হেযবুত তওহীদের মোজাহেদারা সত্যের ধারক, সত্যের বাহক, তাই সত্য কাজ নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতা তাদের নেই। কে কী বলল, কে কী মনে করল তা না দেখে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই পরম পাওয়া ভেবে নিশ্চিন্তে পুরুষদের পাশাপাশি উপার্জনে শরীক হয়েছেন।

জাতীয় অস্থিতিশীলতা নিরসনে দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের নারীরা:

বাংলাদেশের জনগণকে প্রায়শই রাজনৈতিক অচলাবস্থার মাঝে পড়তে হয়। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ, রুদ্ধ হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি। জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ, হরতাল, অবরোধের সর্বনাশা আগুনে জ্বলে ছাই হয় শত শত নিরাপরাধ প্রাণ। এই সবকিছুর প্রধান কারণ হলো জাতীয় অনৈক্য। তাই এ অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে চাইলে সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এই সময়োপযোগী কাজেই নেমেছে হেযবুত তওহীদ, আর তাতে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে আন্দোলনের নারী সদস্যরা। মুমূর্ষু এই জাতির জীবন ফিরে পাবার একমাত্র মহৌষধ নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি দেশজুড়ে ছুটে চলেছে হেযবুত তওহীদের

রাজধানীতে বিভিন্ন দলের স্থানীয় নেত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক বজ্রশক্তির উপদেষ্টা উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী।

নারীরা। তারা ছুটছে পথে-প্রান্তরে, নগরে-বন্দরে, মন্ত্রী-এমপি-পুলিশ প্রধানের কার্যালয় থেকে শুরু করে জেলা-উপজেলার সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, অফিস-আদালত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিক্ষক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, সাংবাদিক, আইনজীবী, কৃষক, শ্রমিক পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের কাছে। এমনকি গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা সঙ্কট নিরসনে সকলকে সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান পৌঁছে দিচ্ছেন।

এর আগে ২০১৩ সালে দেশব্যাপী রাজনৈতিক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করলে, ক্রমাগত হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ, সংঘাত-সংঘর্ষ অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে গেলে সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা যখন নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সহিংসতা দমনে ভূমিকা না রেখে উল্টো সাধারণ মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গ্রাম ছাড়ছিলেন তখন দেশবাসীর বিপর্যয় ঘোঁচাতে হাত বাড়িয়েছিল হেযবুত তওহীদ। তখন হেযবুত তওহীদের মেয়েরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে সাহসিকতার নজির স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। তারা রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা শহর, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে গিয়ে হাজার হাজার বার জনসচেতনতামূলক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও সংস্থা, প্রশাসনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান করে সকলের শর্তহীন সমর্থন পেয়েছেন। হেযবুত তওহীদের মেয়েদের দ্বারা এমন হাজার হাজার ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের দু'হাত তুলে ঐক্যবদ্ধ হবার ঘোষণা দিয়েছেন। পরবর্তীতে সহিংসতা-সন্ত্রাস কমে আসার অন্যতম কারণ ছিল হেযবুত তওহীদের এই দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা, যে কথা পরবর্তীতে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই বলেছেন। সারা দেশ যখন আতঙ্কিত, অতি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ বাইরে বের হয় না, রাজনীতিক দলের নেতাকর্মীরা এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছিল, প্রশাসনের গলদঘর্ম অবস্থা ঠিক সেই সময়ে হেযবুত তওহীদের মেয়েরা ষোল কোটি বাঙালির সামনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জীবনের পরোয়া না করে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে এমন উদ্যোগ কেবল হেযবুত তওহীদের মেয়েদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। কারণ তারা যামানার এমামের অনুসারী, তারা ইসলামের সেই আকীদাই পেয়েছেন, যে আকীদা পেয়ে রসুলের নারী আসহাবরা তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে ফেতনাবাজ শত্রুসেনাকে পরাস্ত করেছিল।

এ ছাড়া দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদ ও হেযবুত তওহীদের মিডিয়া পার্টনারের আয়োজনে যত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশেরই উপস্থাপনা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করেছেন মেয়েরা। অনেক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবেও বক্তব্য রেখেছেন আন্দোলনের নারী সদস্য। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে মানবতার কল্যাণে হেযবুত তওহীদের নারীদের এই আত্মনিবেদন মহান আল্লাহ অবশ্যই সফল করবেন।

আল্লাহর নির্দেশিত হিজাবের যথাযথ বাস্তবায়ন:

বর্তমানে বিকৃত পর্দাপ্রথার অজুহাতে আলেম-মোল্লারা মেয়েদেরকে গৃহকোণে বন্দি করে রাখতে চায়। তারা যে পদ্ধতিতে বোরকা দিয়ে মেয়েদেরকে মুড়ে রাখতে চায় তা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বৈধ নয়। সুরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মো'মেন নারীগণ যেন তাদের শরীরের সাধারণত প্রকাশমান অংশ ব্যতীত তাদের আভরণ বাইরে প্রকাশ না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ কাপড় দ্বারা আবৃত করে। সাধারণত প্রকাশমান বলতে এখানে হাত, মুখমণ্ডল, পায়ের গোড়ালী ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। তাই এমামুয্‌যামান হেযবুত তওহীদের নারীদেরকে এভাবেই হেজাব করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক হেযবুত তওহীদের সকল মেয়েরাই আন্দোলনের কাজে বা ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলে আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে হেজাব করার চেষ্টা করে। মুখমণ্ডল ঢেকে রাখলে মানুষকে চেনার উপায় থাকে না, তাই আল্লাহর নির্দেশমত না করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে হেজাব করা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা।

আন্দোলনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে নারীরা:

হেযবুত তওহীদের মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে একত্রে এমামুয্‌যামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, সালাহ কায়েম করেছেন। কখনও কখনও শুধু মেয়েদেরকে নিয়েও এমামুয্‌যামান আলোচনা করেছেন, সেখানে মেয়েরা তাদের পারিবারিক নানা সমস্যার বিষয়ের সমাধান এমামের কাছ থেকে শুনেছেন, নিজেদের দীন সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন। এ কথা ভুললে চলবে না যে, জাতির প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। একজন মানুষের একটি পা কেটে ফেলে দিলে সে যেমন চলতে পারে না, তেমনি এ জাতিটিও মেয়েদেরকে স্বেচ্ছায় গৃহনির্বাসন দিয়ে নিজেদের একটি পা-ই কেটে ফেলেছে। কবি নজরুল এজন্যই বলেছেন,

"সে গৌরবের গোর হয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়
আঁধার হেরেমে বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে,
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।"

এছাড়া হেযবুত তওহীদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সমস্ত রান্না মেয়েরাই করে থাকে। কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা, সেবাপ্রদান ইত্যাদি কাজেও মেয়েরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

লেখক: হেযবুত তওহীদের সদস্য।

সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় ইবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান

রাকীব আল হাসান

আল্লাহর রসুল এবং প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির মসজিদ থেকে অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছেন, তাঁদের মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তবু যে ভূখণ্ডেই তখন এই জাতি শাসন করেছিল সেখান থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার, যুদ্ধ-রক্তপাত, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা এক কথায় সর্ব প্রকার অন্যায় অশান্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ বর্তমানে সারা দুনিয়াতে এমন বহু মসজিদ রয়েছে যার গম্বুজ সোনার তৈরি। মসজিদগুলোর ভেতর, বাহির এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ যে তা রাজপ্রসাদকেও হার মানায়। কিন্তু সমাজ অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রসুল বর্তমানের এই সময়ের অবস্থাকেই বর্ণনা করে বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রা:) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আল্লাহর রসুলের পবিত্র মুখনিঃসৃত এই বাণীটি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ একেকটা মসজিদ নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তা দিয়ে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের আহার জুটতে পারে, দীন দরিদ্র্যের জীবনকে স্বচ্ছল করা যেতে পারে। আমাদের দেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের অলিতে গলিতে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ। শুধু মসজিদ নয় মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোও যে বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরি হয় তাও মসজিদগুলোর মতোই। এই ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণসহ সেখানকার ধর্মগুরুদের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষ ব্যয় করে থাকে তা যে কোনো সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত অর্থের বহুগুণ। অথচ ঐ উপাসনালয়গুলোতে শুধুমাত্র উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজই হয় না। দিনের বেশিরভাগ সময় সেগুলো তালাবদ্ধ থাকে।

তবে কি স্রষ্টা আমাদের কাছে শুধুই উপাসনার কাঙাল? স্রষ্টা কি শুধুই উপাসনালয়ের মধ্যে থাকেন? মানুষের সকল কল্যাণ কি শুধু উপাসনার মধ্যেই নিহিত? সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই কি মানুষকে উপাসনায় ব্যস্ত রাখা?

না, ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানবতার কল্যাণ করা। কিন্তু সকল ধর্মের মানুষই আজ মানবতার কল্যাণের পথ ছেড়ে শুধু উপাসনালয়ে পড়ে থাকাকেই ধর্ম জ্ঞান করছে, ইবাদত মনে করছে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদত করা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি (সুরা যারিয়াত ৫৬) সেহেতু আমাদেরকে জানতে হবে ইবাদত কাকে বলে। নামাজ রোজা করা, পূজা-অর্চনা, জপমালা জপা, ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় ব্যয় করা ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত ইবাদত নয়। ইবাদত কথাটির অর্থ হচ্ছে যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করা। একটি ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে সময় দেখানোর জন্য, এটা করাই তার ইবাদত। সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে আলো ও তাপ দেওয়ার জন্য, এটা করাই তার ইবাদত।

মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা আগে জানতে হবে। কারণ সেটা করাই তার ইবাদত। মানুষকে কি মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জা, প্যাগোডায় গিয়ে বসে থাকার

ভিন্ন দৃষ্টি

জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামায-রোযা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হাঃ ১৪)। এমনই আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এবাদত ও সালাহ আলাদা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। মুসার (আ.) দায়িত্ব অর্থাৎ এবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হাঃ ২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

পৃথিবী অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, উপাসনালয় থেকে জুতা পর্যন্ত চুরি হয়, চার বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিত হয়, পৃথিবীর মাটি মানুষের রক্তে ভিজে আছে, অথচ এক শ্রেণির লোক মসজিদে গিয়ে যিকির আজকার করেন আর মনে করেন ইবাদত করছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন যে উপাসনা হচ্ছে, মক্কায়-কাশিতে গিয়ে মনে করেন যে, তারা নিষ্পাপ হয়ে গেছেন। ধর্মগুরুদেরকে অর্থদান করে ভাবেন মহাপুণ্যের কাজ করছেন, আসলে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে আছেন। তাদের ইবাদত করা হচ্ছে না। মানুষের প্রকৃত ইবাদত হলো মানবতার কল্যাণে কাজ করা। আল্লাহ বলেছেন, "পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহরই প্রেমে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী (সুরা বাকারা ১৭৭)।

সুতরাং মানুষ কী করলে শান্তিতে থাকবে, দরজা খুলে ঘুমাবে, নির্ভয়ে পথ চলতে পারবে, সেই লক্ষ্যে কাজ করাই হলো ইবাদত। এটা সকল ধর্মের মানুষের জন্যই কর্তব্য। এই অর্থে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বে আছেন তারা যদি কোনো দুর্নীতি না করে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে অবস্থান করেন, মানুষকে শান্তি দেওয়ার কাজ করেন তবে তারাই স্রষ্টার অধিক নিকটবর্তী হবেন। যারা মানবতার কল্যাণে এই কাজগুলো করবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য দরকার হলো নামাজ, রোজা, হজসহ অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগুলো। যেমন একটি বাড়িতে খুঁটি দেওয়া হয় ছাদকে ধরে রাখার জন্য। যদি ছাদই না দেওয়া হয়, তাহলে শুধু খুঁটি গেঁড়ে কোনো লাভ নেই। উপাসনাগুলি হচ্ছে এই খুঁটির মতো। তেমনি যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করবে না, তাদের জন্য এই উপাসনাগুলো কোনো কাজে আসবে না। এগুলো তাদেরকে স্বর্গে বা জান্নাতে, হ্যাভেনে নিতে পারবে না। আমাদেরকে বুঝতে হবে, স্রষ্টা শুধু মসজিদে মন্দিরে থাকেন না। তিনি হাদিসে কুদসীতে বলেছেন, 'আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।' অন্যত্র বলেছেন, 'বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের নিকটবর্তী করে দাও। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' (দায়লামী ও গাজ্জালী)।

রসুলাল্লাহ (সা.) সমগ্র জীবন ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা কিসের জন্য? এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, দুঃখ, দারিদ্র্য, সকল প্রকার বিভেদ দূর করে ঐক্য, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং যাবার আগে এই শান্তি ও ঐক্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তার হাতে গড়া জাতিটির উপর। ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই শান্তি প্রতিষ্ঠা। গৌতম বুদ্ধ (আ.) বুদ্ধত্ব অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করার পর শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্তে কল্যাণ।" সুতরাং বোঝা গেল, ধ্যান করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণই ছিল বুদ্ধের (আ.) প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য। একইভাবে ঈসা (আ.) ইহুদিদের প্রার্থনার দিন শনিবারে শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন করে অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জকে সুস্থ করে তুলেছেন। (নিউ টেস্টামেন্টঃ মার্ক ৩, লুক ১৪)। সাবাথের দিনে তিনি কেন মানুষের এই কল্যাণগুলো করলেন, ধর্মজীবী রাব্বাই সাদ্দুসাইদের দৃষ্টিতে এটাই ছিল যিশুর মহাপাপ। তাই তারা তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষসহ রাষ্ট্রশক্তিকে উসকে দিয়ে তাঁকে একেবারে হত্যা করে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। এভাবেই সকল নবী ও রসুল তাদের জীবন ও কর্ম দিয়ে মানুষের কষ্ট দূর করাকেই ধর্ম বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। মানুষের শান্তিই সকল ধর্মের আত্মা। ওঙ্কার ধ্বনির অর্থ শান্তি, ইসলাম শব্দের অর্থও শান্তি, আবার বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য "সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু- জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।" যে ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সেটা আত্মাহীন ধর্মের লাশ। প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সেটা আর আলো দিতে পারে না, দিতে পারে শুধু কালি। তাই আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলো চালু আছে সেগুলোর বিকৃত অনুসারীরা মানুষকে আলোকিত করার বদলে কালিমালিপ্ত করছে, শান্তির বদলে বিস্তার করছে সন্ত্রাস। তারা ভুলেই গেছে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

ধর্মকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে ঢুকিয়েছে স্বার্থান্বেষী একশ্রেণির ধর্মজীবীর দল। এই

পরাশ্রয়ী ধর্মজীবী শ্রেণিটি সকল ধর্মেই বিদ্যমান। এরা ধর্মকে বানিয়েছে তাদের বাণিজ্যের মূলধন, পুঁজি। নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে করেছে বিকৃত। এদের সামনে যত অধর্মই হোক, যত অন্যায়, অবিচার হোক এরা কোনো প্রতিবাদ না করে মাথা নিচু করে মসজিদে, মন্দিরে, প্যাগোডায়, গীর্জায় গিয়ে ঢুকবে। এদের গায়ে যেন ফুলের টোকাও না পড়ে এ জন্য এরা উপাসনালয়ে ঢুকে নিরাপদ ইবাদতে মশগুল থাকে। মানবতার কল্যাণ, মানবজাতির শান্তি নিয়ে এদের কোনো চিন্তা নেই, যত বেশি মানুষ নামাজ পড়বে, যত বেশি মানুষ পূজা করবে ততই এদের লাভ। দানবাক্স ভর্তি হবে, তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই তারা নির্যাতিত মানুষের শান্তি-অশান্তির দায়িত্ব শয়তান, অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায়, প্যাগোডায় ঢুকেছেন। তারা ধর্মকে বাস্তবজীবন থেকে অপসারণ করে উপাসনা, পূজা-প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত করেছেন।

ধর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই, কিন্তু আত্মাহীন ধর্মও মানুষকে মুক্তি দিতে অক্ষম। কাজেই এখন মানবতার কল্যাণের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ধর্মকে চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ, জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা, প্যাগোডা, আলিশান মন্দির নির্মাণের চেয়ে মানবতার কল্যাণ করা এখন জরুরি। নিরন্নকে অন্নদান, নির্বসনকে বস্ত্রদান, অসহায়, দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি বন্ধ করাই আসল ইবাদত।

শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয় কেন

এস.এম.সামসুল হুদা

বিকৃত ধর্মবিশ্বাস যে বৃহৎ সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো জঙ্গিবাদ। বর্তমান পরিস্থিতিতে জঙ্গিবাদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি বিরাট সঙ্কট। আমাদের দেশও এই সঙ্কটে আক্রান্ত। বরাবরই আমাদের দেশে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শক্তি প্রয়োগের অসারতা ক্রমেই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আমরা বলি না যে শক্তি প্রয়োগের দরকার নেই, প্রয়োজন হলে অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু এটা মূল প্রক্রিয়া নয়। শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে এই সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

জঙ্গিদের যতই হত্যা করা হচ্ছে, তাদের তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ বিকৃত হলেও তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে একটি ধর্মীয় আদর্শ।

আমেরিকা আপস করতে বাধ্য হয়েছে!

এটা কারও অজানা নয় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুপার পাওয়ার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করে, লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী কাজে লাগিয়েও জঙ্গিবাদীদের নির্মূল করতে পারে নি। তাদের এই পথ সফল হয় নি। তারা প্রচুর রক্তক্ষয় করেছে কিন্তু জঙ্গিবাদের প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। আজকে তারা জঙ্গিদের সাথে আপসের রাস্তা বেছে নিয়েছে। কাজেই আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সফলতার আশা করা যায় না।

একজন জঙ্গি মরলে দশজন সৃষ্টি হয়

কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে, তারা জঙ্গি হচ্ছে একটি বিকৃত ধর্মীয় আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে। এক

শ্রেণির স্বার্থবাজ ধর্মব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সেই ভ্রান্ত আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে। তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এটা জেহাদ, এটা করলে তুমি জান্নাতে যাবে, এই কাজে নিহত হলে তুমি শহীদ হবে। এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, প্রভাবিত হয়ে মানুষ জঙ্গি হচ্ছে, সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে- শক্তি প্রয়োগ করে একজনকে নির্মূল করতে গেলে আরও দশজন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তারা আরও সতর্ক, নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে, কোন কিছুতেই তাদের উত্থান ঠেকানো যাচ্ছে না।

জঙ্গিরা দুনিয়া আখেরাত দু'টোই হারাবে

যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কোর'আন-হাদীস, ইতিহাস থেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যারা জঙ্গি হচ্ছে তারা ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে। এই পথে তারা দুনিয়াও হারাবে, আখেরাতও হারাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এদেশের অধিকাংশ লোক বিশ্বাসগতভাবে মুসলমান। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ-রসুলকে। তারা ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের কথায় প্রভাবিত হয়। ধর্মব্যবসায়ীদেরকে যদি শুধুমাত্র বল প্রয়োগে দমনের চেষ্টা করা হয় তখন তাদের অনুসারীরাই

জঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়। এখন অধিকাংশ জনগণকে যদি ইসলামের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এটা বোঝানো যায়, তাদের এই পথ ভুল, এই পথে তারা দুনিয়াও হারাচ্ছে এবং আখেরাতও হারাবে তাহলে আর ধর্মব্যবসায়ীরা কাউকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করতে পারবে না।

বলপ্রয়োগ কখন?

কোর'আন, হাদীস থেকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর পরও অপরাধী চরিত্রের ক্রিমিনাল মাইন্ডেড কিছু মানুষ থাকবে, তারা সংখ্যায় হবে অল্প, তখন তাদেরকে নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন। তখন দরকার পড়বে বল প্রয়োগের। প্রকৃত সত্য যখন মানুষ জানতে পারবে, ধর্মজীবীদের করা অপব্যখ্যা যখন তারা বুঝতে সক্ষম হবে তখন আর জঙ্গিবাদীরা, অপরাজনীতিকারীরা মানুষকে প্রভাবিত করার মতো ধর্মীয় যুক্তি খুঁজে পাবে না। তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে সহজেই নির্মূল করা সম্ভব হবে, এতে অধিকাংশ জনগণ আর বিক্ষুব্ধ হবে না। এই অধিকাংশ জনগণকে ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে যতক্ষণ না বিচ্ছিন্ন করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শক্তি প্রয়োগের পন্থা কার্যকরী হবে না।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি প্রকৃত ইসলাম কী তা মানুষ বুঝতে পারলে এনশা'আল্লাহ কেউ আর জঙ্গি হবে না। তারা সত্যের পথে আত্মনিয়োগ করবে, তারা সম্পদ বিক্রি করে এসে মানবতার কল্যাণে কাজ করবে, মানবতার ক্ষতি করবে না। গত ১৯ বছর যামানার এমামের একজন অনুসারীও একটি সামাজিক অন্যায় পর্যন্ত করে নি, কোনো একটি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আক্রমণের নজির নেই। আমাদের বিরুদ্ধে হাজারো অপপ্রচার করা হয়েছে। আমরা যে আদর্শ প্রচারের কাজ করছি, প্রকৃত ইসলাম মানুষের সামনে তুলে ধরছি সেটা এমামুয্‌যামানের শিক্ষার প্রতিফলন।

ধর্মজীবীরা জঙ্গিবাদ মোকাবেলার উপযুক্ত নয়

তবে হ্যাঁ, আপনারা অতীতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোর'আন-হাদীস দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি, তা নয়। অবশ্যই করেছেন। কিন্তু এই কাজ করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের দিয়ে। অথচ এরাও ধর্মব্যবসায়ী। জঙ্গিবাদ যেমন অবৈধ তেমনি ধর্মব্যবসাও অবৈধ, বিকৃত ইসলামের দু'টি শাখা- জঙ্গিবাদ ও ধর্মব্যবসা। ধর্মব্যবসায়ীদের কোন নৈতিক বল থাকে না, আর যাদের নৈতিক চরিত্র সবল নয়, তাদের পক্ষে এই মহান কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের কথা কেউ শুনবে না, জনগণের মধ্যে তাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, ওয়াজ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে না। মনে রাখতে হবে, একটি মিথ্যা দিয়ে কোনদিন আরেকটি মিথ্যাকে প্রতিহত করা যায় না। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা ধর্মব্যবসা করি না এবং সত্য পথে আছি। কাজেই সমাধান একমাত্র আমাদের হাতেই রয়েছে।

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার

রিয়াদুল হাসান

মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের অধ্যায়টি বিরাট। এ বিরাট অধ্যায়ের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের সামনে এখন দুটো চশমা রয়েছে। একটি ধর্মহীন চশমা, আরেকটি ধর্মের চশমা। এ দুটো চশমার আমাদের অতীত দুটি ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে ধরা পড়ে।

ধর্মহীন চশমা বলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। সকল জীব ও জড়ও এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণিকুলের মধ্যে কেউ উন্নত, কেউ অনুন্নত যা নির্ণীত হয়েছে তাদের অভিযোজনের ক্ষমতার তারতম্য দ্বারা। মানুষ (খুব সম্ভবত) একটি বানরজাতীয় বিবর্তিত প্রাণী, যার আদিপিতা-পিতৃব্যরা গাছে থাকত, তাদের লেজ ছিল। খুলির আকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী তারা নিয়ান্ডের্থাল, ককেশয়েড, মঙ্গলয়েড, অস্ট্রালয়েড ইত্যাদি শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত।

আর ধর্মের চশমা বলছে, এই বিশ্বজগৎ নিজে থেকে সৃষ্টি হয় নি, এর একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি নিরন্তর এটি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করছেন। তিনি বিশ্বজগতে এমন কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্যবস্থা বা চক্র আরোপ করেছেন যার দ্বারা সকল বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টি, পালন, বাস্তুসংস্থান, ধ্বংস ইত্যাদি সাধিত হয়। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি যার উদ্ভব জান্নাতে, যার আদিপিতা আদম (আ.), আদিমাতা হাওয়া (আ.)। তাদের থেকেই আজকের সকল হিন্দু, সকল বৌদ্ধ, সকল মুসলিম, সকল খ্রিষ্টান, আর সকলেই।

একটি চশমা দিয়ে তাকালে দেখি নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) ইত্যাদি বহু উজ্জ্বল নাম। অন্য চশমায় তাদেরকে দেখা যায় না, সেখানে আছে বস্তুবাদী দার্শনিক আর বিভিন্ন রাজবংশের নাম। একটি চশমা বলছে, মানব ইতিহাস নবী-রসুলদের মাধ্যমে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামের ইতিহাস, ধর্মের দ্বারা মানবজাতি শান্তি পাওয়ার ইতিহাস। অন্য চশমাটি বলছে মানুষের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ধর্ম নামক কুসংস্কার ও বর্বরতা দ্বারা। বর্তমানে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, মানুষ অজ্ঞত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা জাতি হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত, ধর্ম ও আধুনিকতা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দন্ডায়মান, দু'নৌকায় পা দিয়ে আছি আমরা। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উপরে যে দুটো চশমার কথা বললাম, বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা, বিশেষ করে মুসলিম নামধারীরা এ দুটো চশমা দিয়েই নিজেদের ইতিহাসকে দেখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। এর প্রভাব পড়ছে তাদের ব্যক্তি থেকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামে মাত্র। এস.এস.সি পর্যন্ত ধর্মের যেটুকু রাখা হয়েছে সেটুকুর উদ্দেশ্য নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান। কারণ এটা অস্বীকার করার মত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি যে, সকল ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা ধর্মেরই অবদান। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এমনভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। যে ধর্ম সেখানে শেখানো হচ্ছে সেটাও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আলোচনা করে, সামাজিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। এটা হচ্ছে মানবজাতিকে ধর্মবিমুখ করে তোলার একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে নানা কারণে এ প্রক্রিয়া কিছুটা সফল হলেও প্রাচ্যে এটি কয়েক শতাব্দী পরও খাপ খাচ্ছে না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু গভীরে যেতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রথমত উদ্ভূত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) নামক এক ব্যক্তি সেকুলারিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। Oxford Dictionary-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc. অর্থাৎ সমাজ কাঠামোতে ধর্মকে সম্পৃক্ত করা যাবে না এমন বিশ্বাস পোষণ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ মতবাদের অনুসারী (Secular) সম্পর্কে বলা হয়েছে, Not connected with spiritual or religious matter. যিনি আধ্যাত্মিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নন।

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে Enlightenment Movement-এর ফসল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্ভব হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে এর অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন দর্শন আমদানি করলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই; ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্তরের ব্যাপার; অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, যুক্তি (logic)-ই জীবন পরিচালনার ভিত্তি হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনার (divine guidance) কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপে এই আন্দোলনের সফলতার ফলে ধর্মহীন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, তাতে মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে গেল, ভোগবাদী হয়ে পড়ল, পূর্বপুরুষ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। সর্বোপরি নীতিবোধের লোপ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ই এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেল।

মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ব্যতীত একটি কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। মানবসমাজে বিরাজিত সকল নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিমানুষকে তাঁর আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, পৃথিবীতে ও পরলোকে কৃ-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত। এমন কি এগুলোর আদি উৎসও বিভিন্ন ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয় তাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না, তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। সে ভাবে যে, নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো।

সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। তাই শিশুকাল থেকেই এ চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি যে, ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় অনন্য হোক এবং তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হোক। অথচ তাদেরকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শিক্ষাই দিয়ে থাকি। আমরা কি দেখছি না যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, চরিত্র বিকিয়ে টাকার মালিক হওয়ার প্রতিযোগিতা, মিথ্যা আর জালিয়াতির ছড়াছড়ি। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। বিকৃত ধর্ম সমাজকে আরো দূষিত করবে। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা যেমন পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে দিতে হবে তেমনি দিতে হবে রাষ্ট্রের উদ্যোগের মাধ্যমে। রাষ্ট্রই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করে। আর সকল পরিবারের পক্ষে সমভাবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক কাঠামোয় তৈরি করা সম্ভব নয়। পরিবারের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার কারণে যেন শিশু সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য সমগ্র জাতিকে এ ভার নিতে হবে। নীতিহীন, চরিত্রহীন মানুষ একটি দানব ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে যখন সে কোনো ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়। এটা উপলব্ধি করে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর The Philosophy of the Modern Education গ্রন্থে অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।"

আপনার সন্তানকে নিয়ে একটু ভাবুন

আজমল হোসইন

শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীগণ,
আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানবেন। আমি আপনাদের পুত্র ও পৌত্রসম একজন তরুণ হিতাকাঙ্ক্ষী। বহুদিনের অব্যক্ত কিছু বাস্তব অনুভূতি ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে বসেছি নিছক দায়বদ্ধতাবশত। অবশ্য এই দায়বদ্ধতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নয়, আমার বিবেক-বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব ও আমার ধর্মের প্রতি। সে দায়মোচনের লক্ষ্যেই এ খোলাচিঠির আশ্রয়।

বহুবার শুনেছি, জেনেছি- শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, শিক্ষা ছাড়াও তেমন বিশ্বদরবারে কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, বারবার তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিসম। একটি মানবশিশু মায়ের গর্ভ থেকেই চর্মচক্ষু লাভ করে, কিন্তু জগতে ওই চর্মচক্ষুই যথেষ্ট নয়। দৃষ্টির সাথে সাথে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-বরণীয়, বৈধ-অবৈধ জ্ঞান প্রদান করে। চিন্তাশক্তি, বোধশক্তির দুয়ার উন্মোচন করে। সুবিস্তীর্ণ নীলাকাশ দেখে কেউ ভূত-প্রেতের নিবাস কল্পনা করে, আবার কেউ গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজী দেখে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণের নকশা আঁকে, মহাবিশ্বের বিশালতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে স্রষ্টার মাহাত্ম কীর্তন করে। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যবধান শুধুই শিক্ষাপ্রসূত। এখন দেখার বিষয় হলো আমরা যে শিক্ষা লাভ করছি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা রেখে যাচ্ছি তা কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে।

আজ আমাদের বাস্তবতা হলো, কোনো তরুণ-তরুণী অসম্ভব প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে নামকরা একটি দেশীয় বা ভিনদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেলে তার পরিবার-পরিজনের আনন্দের অন্ত থাকে না। এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবেশিদের কাছে, যাচিত বা অযাচিত উভয়প্রকারেই। কার ছেলে কোন ভার্সিটিতে পড়ে, কার মেয়ে কোন নামকরা বিদ্যাপীঠে স্থান পেল অভিভাবকরা সেটাকেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এ আত্মতৃপ্তির সঞ্জীবনী রস যে কবে শুকিয়ে গেছে সে খবর কি তারা রাখেন? বিনীত অনুরোধ- আগেই আনন্দে আটখানা হবেন না। আপনার আনন্দের সময় এখনও আসে নি। প্রতিষ্ঠানের নাম-যশ আপনার কোনো কাজে আসবে না যদি না প্রিয় সন্তানের সুশিক্ষা লাভ হয়। যখন দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে সুশিক্ষা লাভ করে মানুষের মতো মানুষ হতে পেরেছে, এই জগৎ-সংসারকে কিছু দিতে পারছে, কেবল তখনই আপনার আনন্দের সময় আসবে। তখন আপনি গর্ব করে বলতে পারবেন- আমার সন্তান শিক্ষিত এবং অবশ্যই সুশিক্ষিত; আমার সন্তান দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে, দেশের মানুষকে ভালোবেসে মানবতার কল্যাণে কাজ করছে। আমি গর্বিত, আমি আমার সন্তানকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু যদি দেখেন আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান দেশের জন্য নয়, মানুষের জন্য নয়, এমনকি পরিবার-পরিজনের জন্যও নয়। নিছক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, নিজের এতটুকু সুবিধা অর্জনের জন্য দেশ-জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে, কিংবা কোনো দেশবিরোধী অসাধু স্বার্থান্বেষী মহলের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন আর গর্ব নয়, আপনার পুত্রের সেই শিক্ষা আপনাকে লজ্জায় ডোবাবে। তাই বলছি, আগেই খুশিতে আটখানা হবেন না, সন্তানের দিকে দেখুন, শুধু বাবা হিসেবে নয় একজন দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে বিচার করুন।

আমিও একজন বাবার সন্তান, আমার বাবাও আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, সন্তানের সাফল্যে বাবা-মায়ের নিঃস্বার্থ আনন্দ পুরোটা অনুভব না করলেও, কিছুটা বুঝি। আপনিও আপনার সন্তানকে নিয়ে সীমাহীন আশাবাদী, সন্দেহ নেই। সেই আশার আলো যাতে অশুভ শক্তির দমকা হাওয়ায় মুহূর্তেই নিভে না যায় সে কারণেই বলছি ভার্সিটি-কলেজে পড়ুয়া সন্তানটিকে আরও একবার দেখুন। চর্মচক্ষুর পাশাপাশি অন্তরের চোখ দিয়ে দেখুন। ছেলে লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া শেষে একদিন চাকরি-বাকরি করবে বা ব্যবসা করবে, কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করবে, অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য তৈরি করবে- যদি এই হয় আপনার বাসনা তাহলে আমার কিছুই বলার নাই। আপনি অপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনার আশা পূরণ হবে, কারণ যুগের হাওয়া ওদিকেই বইছে। তবে আপনার মনস্কামনা যদি হয় এমন, একদিন আপনার সন্তান এই দেশ, সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উন্নত করবে, মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়াবে তাহলে সেই আশা মিছে।

আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যে সন্তান কিছুদিন পূর্বেও আপনার পা ছুঁয়ে সালাম করত আজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পর সে আপনার সাথে কেমন আচরণ করছে? লক্ষ করেছেন কখনও- যে ধর্মের জন্য জীবন বাজি রাখতেও আপনি কুণ্ঠিত নন, যে সংস্কার কাল থেকে কালান্তরে আপনার পরিবার ও সমাজকে সমৃদ্ধি ও সোহাগের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে সেই ধর্ম, সেই সংস্কার-সংস্কৃতির ব্যাপারে আপনার সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন? যে দেশের মাটির জন্য দলবেঁধে মা-মাটি-মানুষের গান গেয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করলেন, সহযোদ্ধাদের হাসিমুখে দাফন করে এলেন, সেই দেশের মাটি ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আপনার সন্তানের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারছে কি? স্মরণ করুন আপনার স্কুল-কলেজ-পাঠশালার শিক্ষকদের কথা যারা এখনও আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় সম্মানের সাথে পূজিত হন। আর বিবেচনা করুন আজ শিক্ষকদের প্রতি আপনার সন্তানের শ্রদ্ধা-সম্মানের পূর্ণতা বা ঘাটতির কথা। আপনার সন্তান কি তার শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে সাফল্যের সাথে জীবন নদী পার হবার প্রেরণা কামনা করছে নাকি উচ্ছৃঙ্খলতা আর ঔদ্ধত্বপূর্ণতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষককে গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করে রাখছে? জুতাপেটা করছে? এসিড নিক্ষেপ করছে?

নিজেকে প্রশ্ন করুন, বিবেকের কাঠগড়ায় বিচার করে দেখুন আপনার প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানটির গতিপথ কোন দিকে? আর চোখ-কান বন্ধ করে থাকবেন না। চারপাশটা

একবার ভালোভাবে দেখে নিন। ভবিষ্যত কল্পনা করুন। দেখবেন গা শিউরে উঠবে। ভয়ঙ্কর এক অতল গহ্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনার সন্তানকে, আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। আমি শিক্ষার বিরুদ্ধে নই। শুরুতেই বলেছি, শিক্ষা ছাড়া যে কোনো জাতি অন্ধ। জ্ঞানের আলো যতক্ষণ না ছড়াবে ততক্ষণ সে অন্ধকার ঘুঁচবে না, সমাজ ও দেশ আলোকিত হবে না। কিন্তু এটাও তো সত্য যে, শিক্ষার নাম করে অশিক্ষা-কুশিক্ষা চালু থাকলে সেটা সমাজের অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করবে।

এ কেমন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চলছি আমরা? শিক্ষাব্যবস্থায় যে রাহু প্রবেশ করেছে তার গ্রাস আমাদের ভবিষ্যতকে দিনদিন পঙ্গু করে ফেলছে, অথচ আমরা নিশ্চুপ! শুধু কি নিশ্চুপ, বরং এই ভয়ানক শিক্ষাব্যবস্থার করাল থাবায় ছেলে-মেয়েকে বন্দী করে রেখে আনন্দে আটখানা হচ্ছি, তাদের সুনিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা করে পুলকিত হচ্ছি। ভাবছি- এই বুঝি জ্ঞানের সূর্য উদিত হয়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা অন্ধকারগুলো দূর করে দিবে, পৃথিবী সেই আলোর ঝলকে বিমোহিত হয়ে রবে। কত উদাসীন আমরা, কত অদূরদর্শী আমরা, সেই সাথে কত নির্বোধ আমরা!

আরো লক্ষ্য করুন, একদা সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আজ ক্লাসে আপনার ছেলেকে কী শেখাচ্ছে, কী পড়াচ্ছে। আপনার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বহু আগেই তার শিক্ষাগুরু (!) নোংরা রাজনীতির ব্যক্তিস্বার্থের হোলি খেলায় মত্ত। তারা আপনার সরল ছেলেটির কানে কত জঘন্য বিষ ঢেলে দিচ্ছে, কীভাবে এক শ্রেণির শিক্ষক বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি একদিনের জন্যও আপনি আপনার সন্তানকে একথা বলেন নি যে, বাবা তোমার ক্লাসে কী পড়ানো হয়, কী কথা শোনানো হয় একটু বল তো। জিজ্ঞাসা করেন নি, কারণ হয়তো ভেবেছেন- আমি ওসবের কী বুঝব? খুব বুঝবেন। যদি সন্তান বোঝাতে চায় অবশ্যই বুঝবেন। আর যদি নেহায়েত অবজ্ঞাবশত আপনাকে এড়িয়ে যায় তাহলে অন্তত এটুকু বুঝবেন যে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কোনো শিক্ষা তাদেরকে দেওয়া হয় না।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম আপনার বংশে কোনো নাস্তিক নেই, ধর্মবিদ্বেষী নেই। আপনি নিজেও স্রষ্টার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ ও তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে থাকেন। আল্লাহ, আল্লাহর রসুল, ধর্মগ্রন্থকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কষ্টের রোজগার থেকে গরীব-দুঃখীকে দান করেন, জায়গা-জমি বিক্রি করে হজ্ব করে আসেন, সমাজের কল্যাণে অবদান রাখেন। কিন্তু আপনার সন্তান আজ এমন কী শিক্ষা লাভ করল যে, খোদ স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নেই সে সংশয় বয়ে বেড়াচ্ছে? এক শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের নাম করে আপনার ছেলে বা মেয়ের মনে-মগজে একটু একটু করে ধর্মবিদ্বেষ প্রবেশ করাচ্ছে, ফলে একটি পর্যায়ে পৌঁছে আপনার সন্তান শুধু নাস্তিকই হচ্ছে না, ঘোর ধর্মবিদ্বষী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে, যার সূত্র ধরে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পরিসরে ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। যারা ধর্মবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তাদের দলে হয়তো আপনার বিশ্ববিদল্যায় পড়ুয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা সন্তানটিও আছে, কিন্তু আপনি তার কিছুই জানেন না। একবার চিন্তা করুন তো, ধর্মপ্রাণ একটি ছেলেকে মগজ ধোলাই করে ঘোর ধর্মবিদ্বেষী বানাতে একটি শ্রেণি কতটা বদ্ধ পরিকর ভূমিকা পালন করেছে? অথচ আপনি ঘুণাক্ষরেও তা টের পান নি। আজ এই ধর্মবিদ্বেষী ছেলেগুলো আপনার-আমার বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ, আল্লাহর রসুল ও ধর্মগ্রন্থকে কতটা অরুচিকর ভাষায় গালাগালি করছে, প্রকাশ্যে লিখে বেড়াচ্ছে তার একটু নমুনাও যদি আপনি দেখতেন লজ্জা ও গ্লানিতে মরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকতো না। সন্তান কিন্তু আপনার, তাকে শিক্ষা-প্রদান করে মানুষের মতো মানুষ করার দায়িত্বও ছিল আপনারই, এটা আপনার এবাদতের অংশ ছিল, সেটা করতে আজ আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। একদিন এর জবাবদিহি আপনাকেও করতে হবে।

আপনি রাত-দিন পবিত্র কোর'আনকে ভালোবেসে চুমু খাচ্ছেন, আর আপনারই সন্তান আল কোর'আনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে, কী দাম রইল আপনার ভালোবাসার? যে নবীর নাম শুনলে আপনার চোখ জলে ছলছল করে ওঠে সেই নবীর শত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে আপনারই সন্তান যখন অকথ্য-অশ্লীল ভাষায় লেখালেখি করে, তখন আপনার ওই নবীপ্রেমের কোনো মূল্যই থাকে না। আপনার সন্তান তো এমন ছিল না? কে তাকে এমন বানালো? ভাবুন, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন। আর এড়িয়ে চলার উপায় নেই, বিষয়টি এড়িয়ে যাবার মতো নয়। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আপনার সিদ্ধান্তের উপর। এখনই যদি না ভাবেন তাহলে অপেক্ষা করুন এর চেয়েও ভয়ংকর কোনো পরিণতির জন্য। কবরে গিয়েও শান্তি পাবেন না। হাশরের ময়দানে সর্বশক্তিমান ও চূড়ান্ত বিচারক আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে শুধু এই নিস্পৃহ-নির্জীব থাকার জন্য। আল্লাহ আপনাদের বোধোদয় ঘটিয়ে জাতিকে রক্ষা করুন।

রাজনীতি ও ধর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জন অশান্তির মূল কারণ

মো: আলী হোসেন:

মানুষের সঙ্গে মানুষের যত সংঘাত সবকিছুর পেছনে স্বার্থের দ্বন্দ্বই একমাত্র কারণ। রাজনীতিকরা বলে থাকেন যে তারা দেশ ও মানুষের জন্য রাজনীতি করেন, কিন্তু বাস্তবে আমরা তার উল্টো চিত্রই দেখি।

আমরা মনে করি, চলমান সংকট নিরসনের জন্য এবং ভবিষ্যতেও এমন সংকটের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য রাজনীতির অঙ্গনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

১. রাজনীতিকরা রাজনীতি করে একটি টাকাও গ্রহণ করবেন না, তারা সরকারি বা বিরোধী দল যেখানেই থাকুন না কেন। মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পর্যন্ত কেউ কোনো বেতন, ভাতা, গাড়ি, বাড়ি, মোবাইল বিল পর্যন্ত রাষ্ট্রের একটি টাকাও গ্রহণ করবেন না। রাজনীতির উদ্দেশ্য হবে শুধু মানবতার কল্যাণ।

২. রাজনীতির মতো ধর্মের কাজ করেও কেউ কোনো অর্থ গ্রহণ করবেন না। কারণ আল্লাহ তা হারাম করেছেন। ধর্মের বিনিময় নিলে সেটা বিকৃত হয়, ফলে ধর্মের নামে অধর্ম প্রচলিত হয়। তখন ধর্ম মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণে বেশি ব্যবহৃত হয়। ধর্ম দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্যই ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভুল পথে পরিচালিত করার সুযোগ পায় যার পরিণামে সৃষ্টি হয় সহিংসতা ও বিদ্বেষ।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা থেকে সম্পাদিত

ব্রিটিশদের তৈরি মাদ্রাসা শিক্ষা

কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা যখন সামরিক শক্তিবলে মুসলিম ভূখণ্ড পদানত করে এবং এই মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাকে পদানত গোলামে পরিণত করে তখনও এ জাতির অনেকের মধ্যেই ইসলামের চেতনা, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য ও মুসলিম হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কিছু হলেও অবশিষ্ট ছিল, তাদের উপর আল্লাহ ও রসুলের হুকুম কী, এ ব্যাপারে তারা সচেতন ছিলেন অর্থাৎ আগুনের শিখা না থাকলেও ঈমানের উত্তপ্ত কয়লা তখনও গনগন করছিল। এ কারণে খ্রিষ্টানরা ক্ষমতা লাভ করলেও তাদের কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টক ছিল না। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনচেতা মুসলিমদের বিদ্রোহ লেগেই ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন, নুরুদ্দিন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলন, ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতে ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহু সংখ্যক জীবন উৎসর্গও করে গেছেন।

এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে খ্রিষ্টানরা যে কয়টি শয়তানী চক্রান্ত করল তার একটি হচ্ছে মুসলিমদেরকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন, সম্পূর্ণরূপে সংগ্রাম বিমুখ, ভীরু, কাপুরুষ এবং খ্রিষ্টান শাসকদের অনুগত নির্বীর্য চরিত্রের মানুষে পরিণত করার জন্য বিকৃত ইসলাম তৈরি করে মাদ্রাসার মাধ্যমে এ জাতির চরিত্রে, আত্মায় গেঁড়ে দেওয়া। (কেরামত আলী জৈনপুরী রচিত মুকাশাফাত-ই-রাহমা গ্রন্থে ১৩ পৃ:)। তারা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করল যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া কালাম, মিলাদের উর্দূ ফার্সি পদ্য বিশেষ করে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করল। এই আত্মাহীন মৃত ইসলামটিকে জাতির মনে মগজে গেঁড়ে দেওয়ার জন্য এই উপমহাদেশের ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে নিজেদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ থেকে **১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬** বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলাম শেখালো। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। তাদের এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করল এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, আচার্য, খ্রিষ্টানদের পাদ্রী, ইহুদিদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশি, বৌদ্ধদের শ্রমণ, ভিক্ষুদের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল। **এই শ্রেণিটি জাতির সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করল তা হচ্ছে- ধর্মের মূল শিক্ষা, প্রধান লক্ষ্যই যে মানবতার কল্যাণ এই দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ধর্মকে কেবল ব্যক্তিজীবনের কিছু উপাসনার মধ্যে বেধে ফেলল এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করল। ফলে ধর্মের দ্বারা আর মানবতার কল্যাণ হলো না।**

যাই হোক, দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মুসলিম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না, তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মাওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, **Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh),** মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curricullum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু করল। উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিষ্টানদের তৈরি বিকৃত ইসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে; শুধু ইদানীং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রি করে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হলে অন্য একটা কিছু করে খেতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত ইসলামটা ১৪৬ বৎসর ধরে শিক্ষা দিয়েছিল সেই বিকৃত, আত্মাহীন ইসলামটাকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি।

ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লাদের কাছে থাকা ইসলামটি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, বরং এটা ব্রিটিশদের শেখানো বিকৃত ও বিপরীতমুখী ইসলাম। প্রকৃত ইসলামটি মুসলিম জাতিকে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্বকারী শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল আর বর্তমানের বিকৃত ইসলামটি মুসলিমদের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, সর্বনিকৃষ্ট দাসজাতিতে পরিণত করেছে; সুতরাং সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় দুটি এক জিনিস নয়। এই প্রচলিত ইসলামটি তৈরি হয়েছে ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের হাতে।

শান্ত-স্নিগ্ধ এদেশ, তাই প্রকৃতি তাদেরকে স্থায়ী হতে দেবে না

রাজনৈতিক সমস্যায় যখন দেশের মানুষের মন থেকে শান্তি তিরোহিত হয়েছে, ঘরে-বাইরে যখন মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট, ব্যবসায়ী, কৃষকসহ সকল শ্রেণির মানুষের মনে যখন উৎকণ্ঠা প্রবলভাবে স্থায়ী রূপ নিয়েছে, পেট্রলবোমা যখন কেড়ে নিচ্ছে জীবন্ত মানুষের প্রাণ, দুঃশাসন কিংবা প্রতিবাদের নামে যখন দেশ কার্যত স্থবির, তখনও কিন্তু প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় প্রকৃতিকে তার কিছুই ছুঁতে পারেনি। ঠিকই বসন্ত এসেছে নির্ধারিত সময়ে। আমের গাছে ঠিকই ধরেছে মুকুল। সাদা সাদা সাজনা ফুল ঠিকই ধরেছে গাছে। অপ্রয়োজনীয় ফুলগুলোও ঝরে পড়েছে। ছোট ছোট সাজনাগুলো ঝুলে আছে ডালে। কচি ধান ক্ষেতে ঠিকই দোলা দিয়ে যাচ্ছে মৃদু সমীরণ।

এই দুঃসময়েও গভীর রাতে ঠিকই বৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যখন দরকার ছিল তখনই ফসলের জন্য তা বয়ে নিয়ে এসেছে মঙ্গলবার্তা। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আশা করার মতো কিছু এখনও দেখা যায়নি। কিন্তু তবুও আশা জাগে একদিন এই দেশ ঘুরে দাঁড়াবে। পুরনো ক্ষতকে পেছনে ফেলে দেশ এগিয়ে যাবে। অন্তত প্রকৃতিকে দেখে তাই মনে হয়। ঘৃণিত এই রাজনীতি একদিন দূর হবেই। এ দেশের মানুষ, এদেশের প্রকৃতির সাথে পেট্রলবোমা আর পোড়া লাশ মানায় না। কালের করাল গ্রাসে কিছু মানুষের হাত ধরে এদেশে প্রবেশ করে এই সহিংসতা। কিন্তু সময়ের আবর্তে তা হারিয়ে যেতে বাধ্য। প্রকৃতি একে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেবে না নিশ্চয়। এটা আমাদের বিশ্বাস। আপাতত কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও এই বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে প্রতিনিয়ত, আমাদের বেঁচে থাকার অণুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। কামনা করি ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাক এই জঞ্জালগুলো। ওরা এদেশের নয়, এদেশের প্রকৃতিতে তারা বেমানান। এদেশ শান্ত সুশীতল বাতাসের দেশ। এদেশ ধীরলয়ে বয়ে চলা নদীর দেশ। এদেশ জ্যোৎস্নার দেশ। শিয়ালের হুক্কা-হুয়ার দেশ। এখানে পেট্রলবোমার আগুন প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এখানে সবুজের সমারোহ, এখানে কোকিলের কুহু কুহু সুরটাই যায়। এখানে রুক্ষতা নয়, এখানে অমানুষেরা কখনোই স্থায়ী আসন গেড়ে নিতে পারবে না। নিশ্চয় এদেশের মানুষ তাদেরকে বিদায় করতে সক্ষম হবে। নিশ্চয় তারা সক্ষম বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনা, সুইস ব্যাংকে টাকা পাচার করা মানুষগুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে। এই বিশ্বাস আছে বলেই এদেশকে এখনো ভালোবাসি। নিশ্চয় এদেশের মানুষ একদিন গর্জে উঠবে। মসনদ রক্ষা আর মসনদ দখলের লড়াইকে স্তব্ধ করে দেবে। শ্বাসমূলের মতো জাগ্রত হবে নতুন চেতনা। পুরনো একঘেয়ে চেতনা স্থান পাবে আঁস্তাকুড়ে। জয় হোক এদেশের মানুষের, এদেশের প্রকৃতি ধরে রাখুক তার আপন স্বভাব। দোয়েল শিষ দিয়ে যাক এভাবেই এই ভোরের মৃদুমন্দ আবহাওয়ায়। কেউ যেন তাদের থামাতে না পারে। কোনদিনও না।

-আতাহার হোসাইন
লেখক ও কলামিস্ট

জাগ্রত জনতা ও নিদ্রিত জনতা

আমরা একটি গান শুনে শুনে বড় হয়েছি - 'একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার, সারা বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার।'

বর্তমানে আমাদের এই দেশবাসী আর কিসের অপেক্ষায় আছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। পাকিস্তানিরা আমাদের দেশের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়েছিল বলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্যও হয়েছিলাম। কেউ যুদ্ধ করেছিল দেশকে ভালোবেসে, কেউ যুদ্ধ করেছিল স্বজন হারিয়ে, কেউ যুদ্ধ করেছিল আত্মরক্ষার জন্য। কারণ যা-ই হোক, যুদ্ধ তাদেরকে করতে হয়েছিল। আজ আমরা তাদের উত্তরসূরিরা কি বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে যুদ্ধ করব বলে বসে আছি? ইতোমধ্যেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির হামলায় দেশের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা ছুঁই ছুঁই করছে। সারাদেশে হরতাল অবরোধের নামে চলছে চরম নৈরাজ্য। রাজনীতিকদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বলি হচ্ছেন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ, দেশের নিরপরাধ সাধারণ নারী পুরুষ এমনকি নিষ্পাপ শিশুদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। ৩ মার্চ এর দৈনিক প্রথম আলোয় ৫৭ দিনের অবরোধে মোট ক্ষয়ক্ষতির একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। সেমতে এই সহিংসতায় মৃত্যুর শিকার হয়েছেন ১১৩ জন। পেট্রোলবোমাসহ নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজে সহস্রাধিক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, ১২৬৪টি গাড়ি আগুনে পোড়ানো ও ভাঙচুর করা হয়েছে। অন্য সংবাদসূত্রে জানা যায়, ৬টি লঞ্চে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, ২৫ দফায় ট্রেনে নাশকতা করা হয়েছে। দেশের প্রায় ১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে রাজনীতি আর ধর্মের নামে।

এত তাণ্ডবেও কি আমাদের ঘুম ভাঙবে না? যে জাহাজের তলা ফুটো হয়ে যায়, সে জাহাজটির ফুটো বন্ধ করার দায়িত্ব প্রতিটি যাত্রীর। আমরা সে উদ্যোগ নিয়েছি, শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব সোপর্দ করে বসে থাকলে হবে না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও দিন-রাত জনগণের সহযোগিতা চেয়ে চেয়ে হয়রান হচ্ছে। সংকট সমাধানের জন্য বিদেশি প্রভুদের ডেকে আনার তোড়জোড় চলছে। তারা আসলে আমাদের রক্ষা করার জন্য আসবে না, ধ্বংস করার জন্যই আসবে - হয় আজ, নয় কাল এই সবুজ দেশটিও পুড়ে ইরাকের মতো অঙ্গার হয়ে যাবে। এখনো সময় আছে দেশকে বাঁচানোর। আমরা চাই না, এ দেশটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হোক। আসুন, আমরা রাজনীতির নামে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ গড়ে তুলি, রুখে দেই এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কালসাপকে। জাগ্রত জনতার সন্ধানে পথে অপেক্ষা করছি আমরা হেযবুত তওহীদ।

মো: সাইফুর রহমান
চাকুরিজীবী, ঢাকা

সাম্প্রতিক ঘটনা বিশ্লেষণ

ইসলামবিদ্বেষীদের রোমান্টিকতা

নিজাম উদ্দিন

অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডে তরুণ মুক্তমনা দাবিদার যে অংশটি অতিরিক্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন তাদের বড় একটি ব্যর্থতা হচ্ছে, এরা কোনভাবেই স্বীকার করে নিচ্ছে না যে অভিজিৎ রায় এবং মুক্তমনা ব্লগটি ধর্ম, বিশেষত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ ছিল। নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে এরা মানুষকে ভুল ধারণার মধ্যে রাখতে চান এবং নিজেদের ধর্মবিদ্বেষী না বলে 'মুক্তমনা' জাতীয় অস্পষ্ট শব্দের আড়ালে আত্মগোপন করতে চান। এই দ্বিধাগ্রস্ততা ও ডাবল স্ট্যান্ড নেওয়ার কারণ, তারা বোঝেন যে এই দেশের মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, এখানে উগ্রবাদী নাস্তিকতা মানুষ পছন্দ করে না। এই মুক্তমনারা রসুলাল্লাহর প্রতি আক্রোশ-বিদ্বেষপরায়ণ, হিংস্র অহঙ্কার লালনকারী। একজন মানুষ যিনি ১৪০০ বছর আগে গত হয়েছেন, অথচ এখনও তিনি প্রায় দেড়শো কোটি মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। দেড়শো কোটি মানুষ তাদের জন্মদাতা পিতার চেয়েও তাঁকে বেশি ভালোবাসে, তাঁর সম্মানার্থে এখনও মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত, উষর মরুর পশ্চাৎপদ একটি জাতিকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে পৃথিবীর প্রভু জাতিতে পরিণত করা। সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মতো দুই দুইটি সুপার পাওয়ারকে একই সঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার মত সামরিক বাহিনী তৈরি করা। পাঁচ লাখের মত জনসংখ্যার একটি জাতিকে নিজেদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় মাতৃভূমিকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর অভিমুখে বের করার জন্য তৈরি করা। তাদেরকে একটি সভ্যতা ও জীবন বিধান দিয়ে যাওয়া এবং সেই জীবন বিধানটাকে নিজে ধারণ করার মত যে বিশাল ব্যক্তিত্ব, তার সামনে এই কূপমণ্ডূক নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষীদের ব্যক্তিত্ব কতই না ক্ষুদ্র। এই সীমাহীন ক্ষুদ্রতার বহিঃপ্রকাশ তারা ঘটিয়েছে রসুলাল্লাহকে ক্ষুদ্র করার অক্ষম প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই আকাশের মত বিশাল, সমুদ্রের মত বিরাট ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা, গৃহাভ্যন্তরের স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ ইত্যাদিকে বড় করে তুলে দিনের পর দিন সেগুলো লিখে যাওয়া, তাঁর প্রতি অরুচিকর ভাষা প্রয়োগ করে ছোট করার চেষ্টা করা যে কত ক্ষুদ্রতা, কত নীচতা, তা এরা উপলব্ধি করতে পারছে না।

এই না পারার একটি কারণ হচ্ছে এরা নিজেরা নিজেরা রোমান্টিক একটি চিন্তা-ধারা সৃষ্টি করে নিয়েছে। তারা কোনো প্রকার ত্যাগস্বীকার না করেই ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা হতে চায়। তারা শ্লোগান দিয়ে, কবিতা লিখে, গান গেয়ে সমাজ পরিবর্তন করে ফেলতে চায়। রাতারাতি জাতীয় নেতা বনতে চায়। পরের টাকায় আন্দোলন করে, হুজুগ তুলে স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে অন্যের মৌলিক মানবাধিকারে কলম চালায়। শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোন মানদণ্ড এরা জানে না, মানে না। বাধাহীন ভোগ-বিলাস, অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা এদের চাহিদা। এই চাহিদা মেটাতে ধর্ম সীমারেখা আরোপ করে বলে ধর্ম এদের চোখের কাঁটা। এরা হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসা মূল্যবোধ, সামাজিক মানদণ্ডকে এক লোহমায় ভেঙে ফেলতে চায়। এরা জানে না অথবা জানলেও পাত্তা দিতে চায় না যে, কত সংগ্রাম-সংঘর্ষ, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, একটি একটি করে ইটের পর ইট সাজিয়ে সমাজ আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এর পেছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদের সমস্ত কৃতিত্বকে এরা অস্বীকার করতে চান। এদের এসব চিন্তাধারা গঠনমূলক নয়, ধ্বংসাত্মক, নিরপেক্ষ নয় একচোখা। তারা দেশের ষোল কোটি মানুষকে মুর্খ

মনে করেন, পক্ষান্তরে নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী মনে করেন। ষোল কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে তারা যে সমাজের স্বপ্ন দেখে সেই চিন্তাধারা রোমান্টিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুবাদী দর্শনের বাইপ্রোডাক্ট এই বিশৃঙ্খল প্রজন্মের হঠকারিতা, রোমান্টিকতা দিনে দিনে পৃথিবীকে আরো অশান্তিপূর্ণ করে তুলছে। শার্লি হেবদোর ঘটনা ও অভিজিৎ হত্যা এরই উদাহরণ। তাদের এই পাগলামিতে সমর্থন দেওয়া কোন যৌক্তিক কাজ হতে পারে না, কিন্তু বিশ্বনেতারা এদেরকেও সমীহ করেন কারণ এরাও যথেষ্ট মৌলবাদী ও উগ্র।

কারো কোন বক্তব্যের উপর অথবা কোন আদর্শের বিপরীতে সমালোচনা বা দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করারও পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া রয়েছে। যথেষ্ট যুক্তি, সাক্ষ্য, প্রমাণ, তথ্য, উপাত্ত তুলে ধরে মার্জিত, সভ্য ভাষায় দ্বিমত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে, অন্যদের বিশ্বাসের স্থলে আঘাত দিয়ে সমালোচনা মূলত গঠনমূলক নয়, বরং ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক; যা দাঙ্গা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র।

দর্শন শাস্ত্রের দেখা যায় একজন দার্শনিক দর্শন তত্ত্বের বা মতের বিপরীতে অন্য দার্শনিকগণ যুক্তি দিয়ে পাল্টা দর্শন প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন- কোরআনের কোন বিষয়ে অসামঞ্জস্য থাকলে তা দেখাতে। যদিও তিনি বলছেন- তোমরা তা পারবে না। (সুরা মুলক-৩)

নবী জীবনের ক্ষেত্রে একটা পরিহাস হচ্ছে, এই বিশাল ব্যক্তিত্বকে এই মুসলিম জনসংখ্যার আলেম দাবিদার ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা রসুলাল্লাহর সংগ্রামী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে অন্তর্মুখী উপাসনাকেন্দ্রিক জীবন অবলম্বন করার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি। যেগুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোন সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, তাদের কাছে এবং যারা আজো রসুলাল্লাহর অবমাননায় ফুঁসে উঠে মানুষ হত্যায় নেমে যান, তাদের কাছেও মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহবায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। মানুষের ইতিহাসে কোন জাতির দ্বারা তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন, শুধুমাত্র এই তথাকথিত মোসলেমদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

এই ধর্মান্ধ মোল্লা ও উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা যেমন নবীর ব্যক্তিগত আচরণ, চলাফেরা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তেমনি কথিত মুক্তমনারাও তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি, অন্দরমহলের গোপন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে, কল্পিত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবিশ্বাস্য গাঁজাখুরী গল্পকে উপজীব্য করে সমগ্র মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং তাঁর আদর্শকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই স্থানটিতে এই দু'টি পক্ষই নবী জীবনের মূল ক্ষেত্রটি ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তাঁর জীবনের মূল দিকটি ধরতে পারলে এবং সেটাকে অনুসরণ করতে পারলে মুক্তমনারা যেমন পেত তাদের কাঙ্ক্ষিত অবিচারহীন দুনিয়া, তেমনি আখেরাতে বিশ্বাসীরা পেত পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক মুক্তি। সেটা না করে এখন এরা অর্থহীন বিষয় নিয়ে একজন আরেকজনকে বিচার-বহির্ভূতভাবে খুন করছে, যা মানব সভ্যতার জন্য বিরাট হুমকি, যা সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে। এই দুই পক্ষের উপর দমন পীড়ন চালিয়ে, জেল ফাঁসি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, কারণ তাদের চোখে আছে আদর্শের ঠুলি। আগে তাদের আদর্শকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে হবে জনগণের সামনে, তাহলে জনগণই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। জনগণ যখন কোনো শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, সেই শ্রেণিটি তাদের কর্মকাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, অথবা সংশোধিত হয় - এটা প্রাকৃতিক।

সম্ভাবনাময় জাতি

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান উল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত) লিখেছেন- "অনেকের মতো আমিও মনে করি বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ। আমি আরেকটু বলতে চাই, আদি নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় মঙ্গোলিয় ও অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংকর প্রজাতির উত্তরাধিকারী এই মেধাবী ও মননশীল বাঙালি জাতি ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বের জন্য পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। কারণ একসময় মানুষের সাদা-কালো-তামাটে সব রং মিশে একাকার হয়ে বাঙালিদের মতই বৈচিত্রময় এক সংকর মানবগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হবে।"

হ্যাঁ, এই বিশিষ্ট ব্যক্তির সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলছি- ইনশা'আল্লাহ সে সময় বেশিদূরে নেই যখন এই বাঙালি জাতি পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে, সারা বিশ্বের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। কিন্তু তার জন্য যাবতীয় অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে জাতির ইস্পাতকঠিন ঐক্য প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাসের শক্তিতে বলিয়ান। এই বিশ্বাসকে স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা ভুল পথে প্রবাহিত হতে দেওয়া যাবে না। তবেই সোনালি সুদিন ফিরে আসবে।

-সম্পাদক

বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় কাবাডি টুর্নামেন্টে খেলছে মাননীয় এমামুয্যামানের প্রতিষ্ঠিত তওহীদ কাবাডি দল।

ক্রিকেট উন্মাদনায় ভাসছে সারা দেশ

হারিয়ে যেতে বসেছে জাতীয় খেলা কাবাডি

খেলাধুলা

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বিশ্বায়নের এই যুগে আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটও এগিয়ে চলেছে- বিষয়টি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গর্বের হলেও একইসাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন এই ক্রিকেটই আবার আমাদের লজ্জায় না ফেলে। এমন আশঙ্কা হবার কারণ আছে। ক্রিকেট কোনো যুদ্ধ নয়, প্রতিশোধের অস্ত্র নয়। এটি একটি খেলা, নিছক বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু ইদানীং আমরা যেন সেটা ভুলে যেতে বসেছি। যে জাতি ভাষার জন্য জীবন দেয়, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে খালি হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে জাতি কীভাবে চরম হানাহানি-রক্তপাতময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতেও খেলাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনায় ভাসতে পারে তা আমার বোঝে আসে না। উন্মাদনা শব্দটি যদিও নেতিবাচক, তথাপি ক্রিকেটের উন্মাদনা যদি ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু এ উন্মাদনা এখন খেলার পরিসর ছেড়ে বাস্তব জীবনেও প্রবেশ করছে।

মাত্র দুইমাসের ব্যবধানে এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া শতাধিক মানুষ চোখের সামনে পুড়ে মরে গেল, নারী-শিশুও উন্মত্ত হায়েনার লোলুপ থাবা থেকে বাঁচতে পারল না। এমতাবস্থায় দেশের কোটি কোটি মানুষের আত্মা কেঁপে উঠার কথা, এ ঘৃণিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার কথা, হিংস্র-নরপশুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা। আমরা কি তা করেছি? করি নি, বরং জাতির এই দুর্দিনে কিনা আমরা একটি ক্রিকেট ম্যাচের জয়কে কেন্দ্র করে আনন্দে-উন্মাদনায় আত্মাহারা হয়েছি! রাস্তায় রাস্তায় নেচে-গেয়ে ফূর্তি করেছি। বিগত দিনগুলোর সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর কথা ভেবে বলুন তো, এ দুঃসময়ে কি এমন উন্মাদনা মানায়?

পরিহাসের এখানেই শেষ নয়। অবরোধ-হরতালের মধ্যে জীবন্ত মানুষ পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হলো, কত পরিবার সর্বশান্ত হলো, কোটি কোটি টাকার সম্পদ পুড়িয়ে ও ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু কোনো কথাতেই, কোনো আর্তিতেই যারা হরতাল বন্ধ করেন নি, তারা কিনা হরতাল বন্ধ রাখলেন ক্রিকেট জয়ের আনন্দ মিছিল করার জন্য! আনন্দ মিছিল করল সরকারি দলও। এটা কি সভ্য মানুষের কাজ হলো? আজ তারা আনন্দ মিছিল করলেন, কই- হাজার হাজার স্বজন হারানো মানুষের কথা চিন্তা করে, কিংবা এখনও যারা বার্ন ইউনিটে কাতরাচ্ছে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে একদিনও তো তারা শোক মিছিল করলেন না, হরতাল বন্ধ রাখলেন না? ক্রিকেট যে একটি খেলা এবং খেলাকে খেলা হিসেবেই উপভোগ করা উচিত সে জ্ঞান কি আমাদের হারিয়ে গেছে? খেলার মাঠে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আমরা ভাবি- এই তো আমরা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের হারিয়ে দিলাম, তারা ১৭৫৭ সালে আমাদের হারিয়েছিল, আমরা ২০১৫ সালে তার প্রতিশোধ নিলাম। কতটা জড়বুদ্ধির পরিচয়! ব্রিটিশ আমাদের হারালো অস্ত্র দিয়ে আমরা তাদের হারালাম ব্যাট-বল দিয়ে, তারা আমাদের মারল ভাতের অভাবে,

আমরা তাদের মারলাম (!) রানের অভাবে। এই ব্যাট-বলের সাথে অস্ত্রের এবং ভাতের সাথে রানের পার্থক্য যদি না বুঝি তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের বোধ-বুদ্ধির গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় দোষের কিছু থাকে কি?

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি। বিশ বছর পূর্বেও এ দেশে কাবাডি অন্যতম জনপ্রিয় একটি খেলা ছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কাবাডিই ছিল বড়দের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় একটি খেলা। গ্রামের বিনোদনপ্রেমী মানুষ ব্যাপক উৎসবমুখর পরিবেশে কাবাডি খেলতো। বলা যায়, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাবাডির সমপর্যায়ের খেলা আর নেই। মানসিকভাবেও ক্ষিপ্রতা, অবিচলতা, মস্তিস্কের গতিশীলতার জন্য খেলাটি অদ্বিতীয়। এসব গুণাবলীর কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় খেলার মর্যাদা পেয়েছে কাবাডি। কিন্তু আজকের তরুণ প্রজন্মের কয়জন এ খেলাটি খেলে বা খেলতে পারে? কাবাডি নামের একটি খেলার যে বাংলাদেশে একসময় ব্যাপক প্রচলন ছিল, পড়াশোনার প্রয়োজনে হয়তো সেটা অনেকেই জানে, হয়তো নিয়ম-কাননও কিছু মুখস্থ আছে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, অধিকাংশ স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ুয়া ছেলে স্বচক্ষে কাউকে কাবাডি খেলতে দেখেনি এবং নিজেরাও খেলে নি। এই হলো বাংলাদেশের জাতীয় খেলার হাল। অথচ এই বাঙালিই কিনা দেশের চরম দুঃসময়েও ক্রিকেটের উন্মাদনায় বিভোর!

বাংলাদেশে এত ক্রিকেট উন্মাদনা এবং স্বদেশী খেলার ব্যাপারে অনীহার অন্যতম একটি কারণ হলো নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে হীনম্মন্যতা। একটি খেলাকে মেরে ফেলার জন্য অন্য আরেকটি খেলাকে প্রণোদনা দেওয়াই যথেষ্ট। ক্রিকেটকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, মিডিয়ার প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চলছে, অন্যান্য খেলা বিশেষ করে কাবাডির ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। কাবাডিকে ভাবা হয় সেকেলে খেলা। অন্যদিকে ক্রিকেট ও ফুটবলকে মনে করা হয় আধুনিক। ক্রিকেটের জন্য যতকিছু করা হয় তার অর্ধেকও যদি কাবাডির পেছনে করা হতো তাহলে আজ শুধু বাংলাদেশ নয়, কাবাডি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি খেলায় পরিণত হতে পারত। সেটাই হতো প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয়। জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, হীনম্মন্যতা এবং বৈদেশিক সংস্কৃতি-সভ্যতার ব্যাপারে অতিরিক্ত অনুরাগী হবার কারণেই বর্তমানে আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

কোনো কিছুতেই ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। ক্রিকেট আমরা অবশ্যই খেলব। আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দল আরও দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা সকলের। কিন্তু অবশ্যই নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। বাঙালি হিসেবে আমাদের যে স্বকীয়তা আছে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু নিয়েই সামনে এগোতে হবে। একটি-দু'টি খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সব ধরনের খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জাতীয় খেলা হিসেবে কাবাডির যে মর্যাদা প্রাপ্য তা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই খেলাধুলার জগতে আমাদের ভারসাম্য ফিরে আসবে। তবে সব কথার শেষ কথা হিসেবে এটাই বলব যে, খেলাকে খেলা হিসেবেই উপভোগ করা উচিত, কোনো কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো

রিয়াদুল হাসান

আগুনের শিখা যেমন সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে তেমনি আবার আগুনের শিখাই মানুষকে রাতের অন্ধকারে পথ দেখাতে পারে। অর্থাৎ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে এটি মানুষের ক্ষতিসাধন করবে নাকি উপকারে আসবে। তরুণ সমাজই জাতির প্রাণশক্তি। তারা জাতি গঠনের কাজ করবে নাকি অপশক্তির দ্বারা দেশধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হবে এ সিদ্ধান্ত তরুণকেই নিতে হবে।

বস্তুবাদী আত্মাহীন শিক্ষার প্রভাবে তরুণ সমাজ আজ নিদারুণ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। একদা যে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আলোয় স্নান করে সে মানুষের মতো মানুষ হতো, সে ধর্ম আজ তাদের কাছে আতঙ্কের অপর নাম। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ধার্মিক হতে দাড়ি, টুপি, জোব্বা পরিধান করতে হবে। তাই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হবে তখনই ধর্মকর্ম করা যাবে। কিন্তু আসলেই কি ধর্ম বার্ধক্যের অবলম্বন?

না। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের অপর নাম মানবতা, আর মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা বৃদ্ধের কাজ নয়। যে নবী-রসুল ও অবতারগণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই করে ইতিহাস ও সভ্যতা নির্মাণ করে গেছেন তারা কি বৃদ্ধ বয়সে এ কাজ করেছিলেন? ভারতবর্ষের পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ, বুদ্ধ, বেথেলহামের যিশু অর্থাৎ ঈসা (আ.), শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.)-সহ অন্যান্য মহামানবদের অধিকাংশই যুবক বয়সেই মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। নবী-রসুল ছাড়াও প্রতিটি দেশে ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে যে মানুষগুলো নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য সমাজ পরিবর্তনে বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ যুবক। দুই শত বছর ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেছেন তরুণেরা, বায়ান্নতে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে তরুণেরা, একাত্তর সনে যুদ্ধ করে এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন তরুণেরা।

অথচ আমাদের এই দ্বিধাগ্রস্ত, দেউলিয়া সমাজ তারুণ্যের সেই অমিত শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তিলে তিলে, তাদের জীবনকে করে দিচ্ছে লক্ষ্যহীন, গন্তব্যহীন, ছন্নছাড়া। তাদের সামনে কোনো অনুসরণীয় নেতা নেই, কলেজে সিট নেই, অফিসে চাকরি নেই, কারখানায় কাজ

নেই, খেলবার মাঠ নেই, কোথা থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই, শেকড়ের সন্ধান জানা নেই, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই, কোথায় চলেছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা। অথচ চারিদিক থেকে সহস্র হায়েনা হা করে আছে তরুণদের এই শক্তিকে গ্রাস করে নেওয়ার জন্য। একদিকে ভোগবাদী সভ্যতার প্রলোভন, অপরদিকে অপরাধ জগতের হাতছানি।

মাদকের কালো থাবা তার তারুণ্যকে নিষ্প্রাণ করছে, অপরাজনীতির সন্ত্রাসী ক্যাডারে পরিণত হচ্ছে সে, ছাত্র রাজনীতির বলি হচ্ছে সে, সে হচ্ছে জঙ্গিবাদীদের হাতিয়ার, গণতন্ত্র বা ধর্মের বড়ি খেয়ে সে নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। তরুণ হচ্ছে অশ্লীল অপসংস্কৃতির শিকার, সে হচ্ছে ধর্মবিদ্বেষী চরমপন্থী নাস্তিক। সে কখনো মদ খেয়ে মাতাল, কখনো ক্রিকেট রসে মাতাল। তরুণ হচ্ছে মানবতাবর্জিত আত্মকেন্দ্রিক টাকার মেশিন। তার জীবন দর্শন হচ্ছে কেবল খাও দাও ফূর্তি করো, প্রেম করো, আড্ডাবাজি করো। সে শিক্ষিত হয়ে হচ্ছে দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, দেশবিক্রেতা। তরুণ নিজের জীবনকে অপচয় করছে, সম্পদের অপচয় করছে, হৃদয়ের অপচয় করছে। সে আসক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমা চাকচিক্যে, ফেসবুকে। তার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে ফেসবুক আর টিভির পর্দায়। বেকারত্ব তাকে নিয়ে গেছে হতাশার অন্ধকারে।

পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা হ্যামেলিনের বাঁশি বাজিয়ে আমাদের তরুণদেরকে কোন গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা ভাবার সময় এসেছে। পশ্চিমা দুনিয়া দু'শো বছর যেভাবে আমাদেরকে শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে, এখন তারা সেই টাকায় ভোগবাদী পণ্যের বাজার খুলে বসেছে। তারা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ভোগবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করছে। তাদের হাজারো পণ্যের বাহারি বিজ্ঞাপনে মানুষ অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে মহা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে আর সেই চাহিদা পূরণের জন্য দিনরাত অর্থের পিছনে ছুটছে। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ উপার্জন, ভোগবিলাস। তাই শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শিশুদের কচি মাথায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে বিষমন্ত্র। লেখা পড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। যেন লেখা পড়ার উদ্দেশ্যই গাড়ি-ঘোড়ায় চড়া।

এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের পরিণাম হচ্ছে এই যে, জাতির সামনে যখন ঘোর দুর্যোগ, জাতির অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, তখনও জাতিকে রক্ষার জন্য তরুণ সমাজের মনে কোনো চেতনা জাগছে না। কারণ তাদের শিক্ষা তাদেরকে দেশ নিয়ে ভাবতে শেখায় না। পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ জন্ম না নেওয়ায় ইতোমধ্যেই জাতীয় অঙ্গনে তরুণ নেতৃত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। যারাও বা পারিবারিক সূত্র ধরে রাজনীতিতে আসছেন তাদের উদ্দেশ্য দেশসেবা নয়, কালোটাকা ও ক্ষমতা। তারা যেন পুরো দেশটাকেই গিলে খেতে চায়, এতই তাদের ক্ষুধা, অল্প বয়সেই তারা টাকার কুমির বনে যাচ্ছে। আজ বাদে কাল যখন এই নৈতিক চরিত্রহীন, আদর্শহীন, আত্মাহীন তরুণরাই দেশের হাল ধরবে তারা এদেশকে কোথায় নিয়ে যাবে?

পশ্চিমা ষড়যন্ত্র, অপরাজনীতি আর ধর্মব্যবসার আক্রমণে পিছু হটতে হটতে আমরা এখন গহীন খাদের কিনারায়। চূড়ান্ত পতন থেকে এ জাতিকে রক্ষা করতে পারে শুধু তরুণ সমাজ। তাদেরকে এখনই জেগে উঠতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আমাদেরকে এই আহ্বান করেছেন চিরতরুণ, চিরযুবক এক বিপ্লবী পুরুষ, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। সকল মিথ্যা ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে যাঁর কলম বজ্রশক্তিতে আঘাত হেনেছে। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে আমরা বাড়িঘর, সহায় সম্পত্তি পেছনে ফেলে অসহায় মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছি। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে দেশপ্রেম ও মানবতা। অথচ বর্তমানে ধর্ম মানেই যেন হাজারো বিধিনিষেধ, এটা করা যাবে না, ওটা পরা যাবে না, সেটা খাওয়া যাবে না। মনে হয় মানুষের জীবনযাপনকে কঠিন করে তোলাই ধর্মের উদ্দেশ্য। কোথাও কোনো আনন্দ নেই, স্বাধীনতা নেই, নির্দিষ্ট পোশাক, নির্দিষ্ট ধাঁচের দাড়ি-টুপি-লেবাসে আবৃত এক নিরানন্দ জীবনের নাম ধর্ম। আসলে কিন্তু তা নয়। ধর্মের যে রূপটি বর্তমানে আমরা দেখছি, সেটা প্রকৃত ধর্ম নয়। শত শত বছরে আলেম নামধারী ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে ফেলেছেন। প্রকৃত ধর্ম কখনোই মানুষের চলাফেরা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচির অভিরুচির উপর হস্তক্ষেপ করে না। তবে বৈজ্ঞানিকভাবেই সব খাদ্য যেমন শরীরের জন্য উপকারী নয়, সব শিক্ষাও মানবসমাজের জন্য উপকারী নয়। ধর্ম কেবল এই ভালো ও মন্দের পার্থক্য প্রকাশ করে, কিন্তু তা মানা বা না মানার ব্যাপারে কারো প্রতি জবরদস্তি করে না। আর অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, অন্যের শান্তি বিনষ্ট করা কেবল ধর্মের দৃষ্টিতে নয়, যে কোনো জীবনব্যবস্থাতেই অপরাধ।

আমাদের তরুণ সমাজ ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু ধর্মের অপব্যবহার দেখে, ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্ট অনাচার দেখে তারা ধর্ম সম্পর্কে আকর্ষণ হারিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এড়িয়ে চলাই কি যথেষ্ট? না। এই বিকৃত ধর্মের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা আপনার ঈমানী দায়িত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব। কারণ বিকৃত ধর্মের ধারক বাহকদের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাদের এত নামাজ-রোজা, হজ্ব, যাকাত, যিকির আজগার কোনো কিছুরই কোনো প্রতিদান তারা আল্লাহর কাছ থেকে পাবে না। কারণ একটি জালনোট দেখতে প্রায় আসল নোটের মতো হলেও তা বিনিময়যোগ্য নয়। এই সমাজে, এই দেশে আপনি বড় হয়েছেন, শিক্ষিত হয়েছেন। তাই এ দেশের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা রয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতির নামে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণমানুষকে সচেতন করে তোলা আপনার সামাজিক দায়িত্ব। আমরা ধর্মের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরছি। বর্তমানে ধর্ম কি, এবাদত কি, স্রষ্টার চাওয়া কি তা তুলে ধরছি যেন আমরা সবাই প্রকৃত ধার্মিক হতে পারি, প্রকৃত এবাদত করতে পারি, স্রষ্টার চাওয়া পূর্ণ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা চান মানুষ যেন শান্তিতে থাকে। তাই যে কাজটি করলে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হবে সেটা করাই মানুষের এবাদত। তিনি চান না যে, বান্দা উপাসনালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে থাকুক আর উপাসনালয়ের বাইরে নিরাশ্রয় মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করুক। বরং তিনি চান মানুষ এমন একটি সমাজ গড়ে তুলুক যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না, কেউ কারো সম্পদ লুটে নেবে না,

প্রতিটি মানুষ এক পরিবারের মতো মিলে মিশে বাস করবে, একের বিপদে অন্যে এগিয়ে যাবে, কেউ কারো থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করবে না, সন্দেহ করবে না। মানুষ নিশ্চিন্তে দরজা খুলে ঘুমাবে। কেউ ভুল করলে সেটা তার সামনে বলবে, পেছনে বলে বেড়াবে না, ষড়যন্ত্র করবে না, জাতির ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ সে করবে না।

এমন একটি সমাজ কল্পনা করা দুষ্কর হলেও এটা সম্ভব, যদি আমরা এই শতধাবিচ্ছিন্ন জাতিটিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। আজ এমন একটি স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজ আমরা গড়ে তুলেছি যেখানে কেউ নিরাপদ নয়, কারণ কেউ কারো বিপদে এগিয়ে যায় না। এখানে দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করে, আর শত শত মানুষ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে দেখে। এরাও নিজেদেরকে ধার্মিকই মনে করেন, কিন্তু তাদের কাছে ধর্মের মানে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যিকির ইত্যাদি। বিপদগ্রস্তকে বাঁচানো তাদের ধর্মের অংশ নয়। তাদের আঁকড়ে থাকা এ ধর্ম আত্মাহীন, মৃত ধর্ম, এ ধর্ম জীবিত মানুষের কোনো কাজে লাগে না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে ঈমান দুনিয়াতে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে না, সে ঈমান কাউকে জান্নাতেও নিতে পারবে না। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়া যেমন সওয়াবের কাজ, রাত জেগে মানুষের চলাচলকে নির্বিঘ্ন করার জন্য রাস্তা পাহারা দেওয়া আরো বড় সওয়াবের কাজ।

যৌবনের ইবাদত আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। আর কবি বলেছেন, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। আসুন, সমাজ থেকে সকল অন্যায় অবিচারকে নির্মূল করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। এটাই প্রকৃত এবাদত। স্বাধীনতার পর গত ৪৩ বছরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আমরা চিরকাল ভিক্ষুকের জাতি হয়ে থাকি। এ ষড়যন্ত্রের জাল আমাদের কাটতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে মানবজীবন কত মূল্যবান। আমি পশু হয়ে জন্মাতে পারতাম, তা না হয়ে আমি মানুষ হয়েছি। তবু আমি কেন পশুর মতো জীবনযাপন করছি? খাচ্ছি, ভোগ করছি, বংশবিস্তার করে মরে যাচ্ছি। এটাতো পশুর জীবন। মানুষ তো সেই, যে অন্যের জন্য বাঁচে। যে অসহায় মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করে, নিজের জীবন ও সম্পদ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে তারই মানবজন্ম সার্থক হয়। সেই তো অমর জীবন লাভ করে, সেই হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উদাহরণ।

লেখক: হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ: মোফাজ্জল হোসাইন

সিরিয়ার পথেই হাঁটছে না তো বাংলাদেশ?

"আমরা কেউই আসলে ভাবতে পারিনি এ সংকট আমাদের আজকের পরিস্থিতিতে নিয়ে আসবে। শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনে সরকারের কঠোর পদক্ষেপই একে সহিংস লড়াইয়ে পরিণত করে। এর পরিণতি আজ ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে। এখান থেকে উত্তরণে কোনো আশার আলো আর নেই।" সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের ৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দেশটির ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে এভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেন সিরীয় শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষক মারওয়ান কাবালান। দেশটির ভয়াবহতার চিত্র এককথায় হৃদয়বিদারক। প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার লড়াই সেখানে। একেকটি দিন পার হওয়া মানেই একেকটি নতুন জীবন। সেখানে জীবন মানেই যুদ্ধ। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের যুদ্ধ। ৪ বছর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও সংকট সমাধানের ক্ষীণ আশাও দেখছেন না গৃহযুদ্ধ পীড়িত দেশটির জনগণ।

জাতিসংঘের হিসাবমতে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত ২ লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আরও অন্তত ৭০ লাখ। বিভিন্ন দেশে শরণার্থীর জীবন কাটাচ্ছেন তারা। শিক্ষাহীনভাবে বেড়ে উঠছে শিশুরা। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে তাদের জীবন। বিশ্ব দাতা সংস্থাগুলো বলছে, সংকট নিরসনে জাতিসংঘ পুরোপুরি ব্যর্থ।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিও দিনে দিনে একই দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা ভেবে দেখা উচিত, কারণ দুই দেশেরই প্রেক্ষাপট প্রায় অভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা কথিত আরব বসন্ত আন্দোলনের রেশ ধরে সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে পশ্চিমা মদদপ্রাপ্ত বিরোধী পক্ষ। বিরোধীরা ক্রমেই উগ্রপন্থার দিকে অগ্রসর হলে সরকারও ক্রমশ কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের উপর অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয় সরকার। দমননীতি গ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতিই হচ্ছে সহিংসতা বৃদ্ধি। মুহূর্তের মধ্যে গণজাগরণমূলক আন্দোলনটির সঙ্গে সরকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সুযোগ পেয়ে বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দিতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলো।

বাংলাদেশেও আজকে সেই কথিত গণতন্ত্রের দাবিতেই সরকারবিরোধীরা আন্দোলন করে যাচ্ছে। তাদের আন্দোলনও নাশকতার রূপ নিয়েছিল ২০১৩ সনেই। এখনও চলছে হরতাল অবরোধের নামে লাগামহীন সহিংসতা ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ। সরকারও যথারীতি সিরিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, কঠোরহস্তে বিরোধীদের দমনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। গণপিটুনি ও ক্রসফায়ারের নামে চলছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। কেউ কাউকে এতটুকু ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। একটি দেশের অধিবাসীরা যখন নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত, বিশেষ করে তারা যখন ধর্মীয় দিক

থেকেও মুসলিম। গত ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বর্ষপূর্তির দিনে ঢাকায় সমাবেশ করতে না পেরে সারা দেশে অবরোধের ডাক দেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এর ফলে ফিরে আসে আবার আগুন ও বোমার নাশকতা। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া প্রতিদিনই অবরোধের সঙ্গে হরতাল করছে ২০ দলীয় জোট। এই কর্মসূচিতে নাশকতা ও সহিংসতায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১১৯ জন, যার মধ্যে ৬১ জন পেট্রলবোমায় ও আগুনে দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এছাড়া সারা দেশে প্রায় ১৮০০ গাড়ি আগুন ও ভাঙচুরের শিকার হয়। নাশকতার এসব ঘটনায় সারা দেশের অসংখ্য মামলা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত চারটি মামলায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে করা হয়েছে হুকুমের আসামি। নাশকতায় জড়িতদের ধরতে পুলিশের চলমান অভিযান অব্যাহত রয়েছে। নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দিতে সরকার, পুলিশ ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের হিসেব মতে, প্রতিদিন গড়ে সোয়া দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে। প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী পর্যন্ত প্রত্যেকে আজ ক্ষতিগ্রস্ত। শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় অচল। এখানেও এই সহিংসতায় পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলো। তারা গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্না করে সংঘাতকারীদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিএনপির যুগ্মমহাসচীব সালাহ উদ্দিন আহমেদের নিখোঁজ হওয়া সরকারের উপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। বিএনপি বলছে সরকার তাকে গুম করেছে আর আওয়ামী লীগ বলছে সে নিজেই আত্মগোপনে গেছে। এক কথায় পরিস্থিতি মোটেও সুখকর নয়।

সিরিয়া পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতির পার্থক্য এই যে, এখানে শিয়া-সুন্নী বিরোধ অর্থাৎ ধর্মীয় ইস্যুটি প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু ২০১৩ সনে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত কাদের মোল্লা ও মওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে ব্লগার ও হেফাজতের পাল্টাপাল্টি হুজুগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এবারও অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের ইস্যুতে রাজনীতিক পরিস্থিতি তাঁতিয়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল যা এখনো হারিয়ে যায় নি, কেননা উক্ত হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা গ্রহণ করেছে। অভিজিৎ ইস্যুটি ধর্মীয় রূপ নিতে পারে নি একজন মাহমুদুর রহমানের অভাবে এবং ধর্মব্যবসায়ীদের ৫ মে'র অভিজ্ঞতার দরুন। কিন্তু আবার সহিংসতার পালে হাওয়া লাগতে কতক্ষণ, বিশেষ করে যখন সরকারবিরোধী পক্ষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়? সিরিয়াতে সহিংসতা যতটা দ্রুত ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, এখানে এখনো তা সেই মাত্রা পায় নি, তবে এটা কেবলই সময়ের হিসাব। লাগাম টেনে ধরতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও যে পরিস্থিতি হুবহু সিরিয়ার মতো ধারণ করবে না তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। আজ আমাদের রাজনীতিকরা এক অশুভ দানবের ইশারায় ক্রীড়নক হয়ে খেলছেন মাত্র। জাতির ভবিষ্যৎকে তারা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সে দিকে কোনো খেয়াল নেই তাদের। আজ যদি এই রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণ নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এতটাই অপরিণামদর্শী থেকে যান, দেশের স্বার্থ চিন্তা না করে কেবলই নগদ স্বার্থের হিসাব করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমাদেরও কেউ একজন সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মারওয়ান কাবালানের ন্যায় বলবেন, "আমরা কেউই আসলে ভাবতে পারিনি এ সংকট আমাদের আজকের এই মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে নিয়ে আসবে। আজ এখান থেকে উত্তরণের কোনো আশার আলোই আর নেই।"

এমনিতেই ধর্মব্যবসায়ীদের কিছুদিন পর পর তাণ্ডবলীলা আর অপরাজনীতির দুষ্টক্ষত, সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের সম্পূর্ণ হুমকির মধ্যে পড়ে আছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। চারিদিক থেকে শিয়াল, শকুন, হায়েনার দল খামছে ধরছে মানচিত্র, গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে জাতির বুকের উপর। কাজেই বাহির ও ভেতরের এই যাবতীয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জনতার ঐক্য এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

শান্তি অথবা গণতন্ত্র আমরা কোনটা চাই?

মাহবুব আলী

স্বাধীনতা পরবর্তী গত ৪৩ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সর্বাধিক মুখনিঃসৃত শব্দ সম্ভবত, গণতন্ত্র। রাজনৈতিক জনসভার বক্তৃতায়, মিটিং-মিছিলে, সেমিনার বা টকশোতে গণতন্ত্রের জয়গানের শেষ নেই। চলমান গণতন্ত্র আমাদেরকে মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ছাড়া কিছু দিতে না পারলেও বিজ্ঞাপনের জোরে এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা এতটাই যে, আমাদের মনমগজ-চিন্তাধারা সবই আজ গণতান্ত্রিক। সাধারণ মানুষ রাজনীতি আর গণতন্ত্র বলতে বোঝেন ক্ষমতায় গিয়ে স্বার্থ হাসিলের বিশেষ কৌশল। এর বেশি তারা বোঝেন না। গত ৪৩ বছর ধরে রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষের উপর যে কশাঘাত করা হচ্ছে তার দ্বারা আমাদের সবার পিঠ রক্তাক্ত। তবু প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। এর কারণ আমরা মনে করছি এই চাবুক গণতন্ত্রের নয়। গণতন্ত্র আসলে ভালো, আমাদেরকে পেটাচ্ছে অগণতান্ত্রিক শক্তি। আসলে এ ধারণা ভুল। এই আঘাত গণতন্ত্রেরই কশাঘাত, এর বেশি আর কিছু আমাদের প্রাপ্য নয়। যতদিন আমরা স্বার্থবাদীদের ছেলেভোলানো মন্ত্রে ভুলে থাকবো, ততদিন এই চাবুকপেটা খেয়ে যেতে হবে। যে তন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত, সন্ত্রাসী, চোর-ডাকাতদের হাতে নেতৃত্ব দেয়, যে তন্ত্র গরীবের রক্ত শুষে নিয়ে ধনীর ব্যাংকে

অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে, যে তন্ত্র রাজনীতিক প্রতিহিংসার জন্ম দেয়, যার বলি হয় নিরীহ, নিরপরাধ জনগণ, খেটে খাওয়া মানুষ, নিষ্পাপ শিশু। সেই গণতন্ত্রকেই আমরাই আদরে লালন করি, ভোট দিয়ে তার গোড়ায় পানি সিঞ্চন করি। আমরা বুঝি না যে, এ বৃক্ষ বিষবৃক্ষ, এর বিষফল আমাকেই খেতে হবে। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভোটাররা যদি বুঝতেন দেশে দুই দিন পর পর যে এই যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়, জীবন্ত ভোটারকে রোস্ট করা হয়, মানুষের সহায়-সম্পদ-জীবনের সকল অবলম্বনকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়, এটাই গণতন্ত্রের মূর্তিমান রূপ। এই সত্য তাদেরকে বুঝতে দেওয়া হয় না, কারণ তারা বুঝে গেলে ভোটবাক্স যে খালি পড়ে থাকবে। আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্রের নামে যে ভালো ভালো কথাগুলো লেখা আছে, সেগুলোর আশায় মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, দিন গুনে গুনে পরলোকে যাত্রা করছে, কিন্তু সেই কল্পরাজ্য, গণতন্ত্রের ইউটোপিয়া সংবিধানের পাতা থেকে আর বস্তুজগতে মূর্তিমান হচ্ছে না।

একাত্তরের পর থেকে আজ অবধি গণতন্ত্রকে যদি আমরা পরীক্ষামূলক রাজনীতিক মতবাদ হিসেবে ধরি, দেখব এর সামগ্রিক ফলাফল অনেকগুলো শূন্য, সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন জাতির কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। এই তন্ত্র টিকে আছে কেবলই ষোল কোটি মানুষের অনৈক্যের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প না থাকার দরুন। তাই আমরা গণতন্ত্রের উপরই আস্থা রাখতে চাই, মার খাওয়ার অসম্ভব ক্ষমতা নিয়ে আমরা বাঙালিরা জন্মেছি। আমাদের পূর্বপুরুষ মার খেয়ে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা মার খেতেন বিদেশি শাসকদের হাতে, আমরা মার খাই আমাদের ভোটে নির্বাচিত শাসকদের হাতে। কোনটা উত্তম তা মহাকালই বিবেচনা করবেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমরা সেই একাত্তর থেকে আজ অবধি প্রতিনিয়ত ঢেলে যাচ্ছি বুকের রক্ত। দেশ গড়ার দিকে আমাদের নেতাদের নজর নেই, ডাস্টবিনে কুকুর যেমন আবর্জনার দখল নিয়ে কামড়া কামড়ি করে, আমাদের ভদ্র, সুশীল, সুবেশি রাজনীতিকরা তেমনটাই করেন জাতির সম্পদ লুটে খাওয়ার জন্য। তাদের স্বার্থের লড়াইয়ে ককটেল-পেট্রল বোমায় ঝলসিয়ে যাচ্ছি নিজেদেরকে, তবু আমরা এই অন্যায় তন্ত্রের বিরুদ্ধে এক হতে পারি না, কেবল কেঁদে যাই। আমাদের কান্না দেখার কেউ নেই। আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা ভোটার।

গণতন্ত্র আমরা পেয়েছি মূলত ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা দুইশ' বছরের শাসন-শোষণ চালিয়ে যখন উপমহাদেশ ছেড়ে আমাদেরকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল, তখন চাপিয়ে দিয়ে গেল গণতন্ত্র নামের এই সোনার পাথরবাটি। আজ ব্রিটিশপরবর্তী অর্ধশত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও আমরা সেই সোনার পাথরবাটির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি নি। গণতন্ত্রের একটাই সুবিধা, এর চর্চায় মানুষ বাক্যবাগিশ হতে পারে, যে বাক্যগুলোকে ফাঁকাবুলি বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। বলা হয়ে থাকে- গণতন্ত্র এমন একটি পদ্ধতি যেখানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন যারা জনগণের বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন (Of the people)। গণতন্ত্র হলো একটি সর্বসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার পদ্ধতি (By the people)। এই ব্যবস্থার অধীনে শাসকগণ নির্বাচিত হয়ে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে দেশ শাসন করেন। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, 'যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি তা কুলীনতন্ত্র এবং যেখানে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা গণতন্ত্র।' কল্পবিলাসী সাম্যবাদের পতনের পর গণতন্ত্রের এইসব তাত্ত্বিক বুলিই পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তারে অবদান রেখেছে। এসব মনোলোভা এবং আকর্ষণীয় কথা-বার্তায় আমাদেরকে মোহিত করে রাখা হচ্ছে। কেউ যদিওবা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলা হয়, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকরূপ পায় নি, গণতন্ত্র এদেশে এখনো শিশুকাল পেরোয় নি ইত্যাদি। আসলে আমরা ভাবছি, পশ্চিমারা যে আজ এত চাকচিক্যের মধ্যে বাস করছে, এটা বুঝি গণতন্ত্রের ফল। আসলে তা নয়। তারা দীর্ঘ দিন প্রায় আড়াই শতাধিক বৎসর সারা বিশ্বটাকে উপনিবেশ বানিয়ে, তাদের সম্পদ লুটপাট করে নিজেদের দেশকে উন্নত করেছে। আসলে তারাও সুখে নেই। তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অপরাধ অর্থাৎ খুনো-খুনি, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি সামাজিক অপরাধের পরিসংখ্যান দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, পাশ্চাত্যের সমাজকে যতটা সুখী মনে করা হয়, মোটেও তারা ততটা সুখী নয়। প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মাঝেও রয়েছে বিরাট আর্থিক বৈষম্য। টিভিতে যেটা দেখা যায় সেটাই সব নয়, আরো আছে অনেক কিছুই।

পশ্চিমা গণতন্ত্রকে প্রাচ্যে বড় করতে গিয়ে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো:

ক) জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি:

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বহুদল ও বহুমতের নামে জাতি বিনাশী অনৈক্যর জন্ম দেয়া। গণতান্ত্রিক ভাষায় বলা হয়ে থাকে- যে দেশে যত বেশি রাজনৈতিক দল থাকে সেই দেশের গণতন্ত্র তত বেশি পরিপক্ক। বাস্তবতায় বহুদল ও বহুমতের পরিণাম হচ্ছে অনৈক্য, বিভেদ ও অশান্তি। একটি জাতির উন্নতির প্রথম সূত্রই হলো ঐক্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বুনিয়াদিভাবেই গণতন্ত্র অনৈক্যের সকল উপাদান বিলিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি তার বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনসমূহকেও বৈধতা প্রদান করে। এর সূত্র ধরে দলের ভেতর সৃষ্টি হয় আরো উপদলের। স্বাভাবিক ফলাফল দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল, হানাহানি, ক্ষমতা ও পদ দখলের লড়াই। অর্থাৎ গণতন্ত্র একই মত ও পথে বিশ্বাসীদেরকেও এক সূত্রে আবদ্ধ হতে দিতে চায় না। তারা বিপক্ষ শক্তির চেয়ে নিজের দলের দ্বারাই বেশি আক্রান্ত, হতাহত হয়।

(চলবে)

পরবর্তী পর্বে থাকছে-

খ) অহেতুক বিরোধীতার বৈধতাদানকারী গণতন্ত্র:

গ) নেতা নির্বাচনে ভুল পদ্ধতি:

ঘ) গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন:

ঙ) ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন:

চ) গণতন্ত্রের সার্বিক ফলাফল:

চোখ রাখুন সংকলনের পরবর্তী সংখ্যায়

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐক্যের গুরুত্ব এবং অনৈক্যের পরিণাম

মো: হাসানুজ্জামান

মানবজাতির পার্থিব ও পারলৌকিক অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর বার্তাবাহকগণ সত্যধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সকল ধর্মই সত্য- ন্যায়, কল্যাণ এবং মানবজাতির শান্তির পক্ষে কথা বলে। কারণ স্রষ্টা হলেন যাবতীয় সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের আধার। স্রষ্টা প্রেরিত দীনের সর্বশেষ সংস্করণ হলো দীনুল ইসলাম। পৃথিবী থেকে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, যুদ্ধ-রক্তপাত এক কথায় অশান্তিকে নির্মূল করে, মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই শেষ নবীর আগমন। এ জন্য মানবজাতির মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য। এ জন্য ইসলাম ঐক্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে অনৈক্য এই মহাপরিকল্পনার পথে প্রধান অন্তরায়। তাই এই দীনের বিধানগুলোও অনৈক্যের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠিন। সারা দুনিয়ার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাত-পাত, হিংসা-বিদ্বেষ লুপ্ত করে তাদেরকে এক কাতারে নিয়ে আসার মতো অসাধ্য সাধন করা যার উদ্দেশ্য, সেই মহামানব সর্বপ্রথম যে কাজটিতে মনোনিবেশ করেছিলেন তা হলো সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। ইতিহাসে পাই- তদানীন্তন আরবের ৫ লাখের একটি জাতিকে তিনি (সা.) তাঁর জীবদ্দশাতেই ঐক্যবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এর কারণও অতি সোজা। তিনি এটা ভালোভাবেই জানতেন যে- তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এক জীবনে পূর্ণ করে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

তাই তিনি তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই জাতিটিকে হাতে-কলমে এমন শিক্ষা দিয়ে গেলেন যাতে এই ঐক্যবদ্ধ জাতিটি তাঁর চলে যাওয়ার পরেও আপ্রাণ সংগ্রাম করে সমস্ত পৃথিবীকে ঐ শিক্ষা পৌঁছে দিয়ে মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারে। তিনি জানতেন এই কাজ এই জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকবে। ঐক্যের হানি ঘটলেই জাতি তার চলার গতি হারিয়ে ফেলবে এবং এক সময় স্থবির হয়ে পড়বে- উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এটা পৃথিবীর এক অমোঘ নিয়ম যে- একটি জাতি কিংবা একটি সংগঠন যত শক্তিশালীই হোক, ধনে-বলে যতই উন্নত হোক, যদি তাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে তারা কখনোই জয়ী হতে পারবে না। অতি দুর্বল শত্রুর কাছেও পরাজিত হবে। তাই আল্লাহ বহুবার কোর'আনে এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য তাঁর রসুল (সা.) সদা শংকিত ও জাগ্রত থেকেছেন। ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো কথা বা কাজ যখনই কাউকে করতে দেখেছেন তখনই তিনি ভীষণ রেগে গেছেন।

রসুলাল্লাহর জীবনী যারা ভাসা ভাসাভাবেও পড়েছেন তারাও এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে- তাঁর নবী জীবনের ২৩ বছরে তিনি কত অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মক্কা ও তায়েফের মাটিতে তাঁকে মোশরেকদের ক্রীড়া-কৌতুকের পাত্র হতে হয়েছে, প্রস্তরাঘাতে পবিত্র দেহ থেকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি ঐ মোশরেকদের উপর রেগে গিয়েছেন বা তাদের অভিসম্পাত করেছেন এমন কোনো নজির কেউ দেখাতে পারবে না। বরং তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত কামনা করেছেন। কিন্তু সর্বরিপু জয়ী ঐ একই ব্যক্তির রাগও আমরা দেখতে পাই তাঁর পবিত্র জীবনীতে। না, সেটা মোশরেকদের জর্জরিত করা আঘাতের কারণে নয়, তাঁরই প্রাণপ্রিয় আসহাবদের মধ্যে কাউকে যখন কোর'আনের কোনো আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে দেখেছেন তখন তিনি রেগে লাল হয়ে গেছেন। তাঁর আসহাব এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোতাবেক রসুলকে আমরা সর্বদাই একজন সদা হাস্যময় এবং শান্ত-সৌম্য মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া তাঁর চরিত্রে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই মানুষটিও রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছেন। কখন হয়েছেন? যখন তিনি কাউকে এমন কোনো কাজ করতে দেখেছেন যার ফলে তিলে তিলে গড়ে তোলা তাঁর আজীবনের সাধনা, অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ যে কাজের ফলে তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তাঁর পবিত্র জীবনীতে আমরা পাই, একদিন দুপুরে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) রসুলাল্লাহর গৃহে গিয়ে দেখেন তাঁর মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি (দঃ) বললেন- কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে যে কোনরকম মতভেদ কুফর। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ (উম্মাহ) তাদের (ওপর অবতীর্ণ) কেতাবগুলোর (আয়াতের) অর্থ নিয়ে মতবিরোধের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বললেন, (কোর'আনের) যে অংশ (পরিষ্কার) বোঝা যায় এবং ঐকমত্য আছে তা বলো, যেগুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (মতবিরোধ করো না) [হাদিস-আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে- মুসলিম, মেশকাত]।

এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে মতভেদ থেকেই

অনৈক্যের সূত্রপাত। আর অনৈক্য মানেই ব্যর্থতা, দুর্বল শত্রুর কাছেও পরাজয়। সুতরাং সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র জীবনের সব সংগ্রাম, ত্যাগ যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে তা কি করে তিনি মেনে নিতে পারেন? এ কারণেই আমরা সর্ব রিপু জয়ী এই জিতেন্দ্রিয় মহামানবকেও রেগে লাল হতে দেখেছি।

তাই মুসলিম জাতির ঐক্যের গুরুত্ব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের বিরুদ্ধে, রসুলাল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের চেয়েও বড় অপরাধ হলো মুসলিম জাতির মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করা। কারণ জাতির মধ্যে যে কোনো রকমের মতভেদের সূত্রপাতই অনৈক্য সৃষ্টি এবং পরিণামে জাতি ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এ কারণে রসুলাল্লাহ ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথা, কাজ বা ইশারা-ইঙ্গিতকেও কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ ও রসুলের এমন স্পষ্ট আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও মুসলিম জাতি আজ শরিয়াহগতভাবে শিয়া-সুন্নি, হানাফি, মালেকি, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদিস; আধ্যাত্মিকভাবে- কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, আহলে বাইত, ভৌগোলিকভাবে ৫৫ টিরও বেশি রাষ্ট্রে এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতা দাজ্জালের নকল করে রাজনৈতিকভাবে কেউ গণতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ সাম্যবাদী, কেউ রাজতন্ত্রী, কেউ পুঁজিবাদী ইত্যাদি হাজার হাজার ভাগে বিভক্ত।

কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন- 'সকল মুমিন ভাই ভাই।' হাদিসে রসুলাল্লাহ বলেছেন- 'উম্মতে মোহাম্মদী জাতি যেন একটি শরীর, তার একটি অঙ্গে ব্যথা পেলে সারা শরীরেই ব্যথা অনুভূত হয়।' অথচ আজ আর তারা এক জাতি, ভাই-ভাই তো নয়-ই উপরন্তু নিজেরা নিজেরা মারামারি-হানাহানি, রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বোমাবাজি করে চূড়ান্ত ঐক্যহীন ও শতধা বিচ্ছিন্ন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর তাই রসুলাল্লাহ তাদেরকে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সেই উদ্দেশ্য অর্জন করাও তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

শুধু শেষ রসুলের উম্মাহ হিসেবেই নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি আমরা মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করি তাহলে মানুষকে সমস্ত প্রকার বিভক্তি- ব্যবধান ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মানুষ একই দম্পতি বাবা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) থেকে আগত, সুতরাং মানুষকে সেই আদি পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই।

জান্নাতের পূর্বশর্ত কী? তওহীদ নাকি সালাহ?

জাকারিয়া হাবিব

সালাহ্ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে ৮০ বারেরও বেশি সালাহ্'র কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আকিদা অর্থাৎ ধারণা আজ বিকৃত হয়ে গেছে। কেউ একে মনে করছে ধ্যান, কেউ মনে করছে আল্লাহর সামনে প্রণতি স্বীকারের পন্থাবিশেষ, কেউ কিছুই মনে করছে না, ভাবছেন আল্লাহ করতে বলেছেন তাই করতে হবে, সওয়াব হবে ইত্যাদি। অথচ একটি জিনিস সম্পর্কে যদি সঠিক ধারণাই না থাকে তাহলে সেটা থেকে কারও কোনো উপকার হাসিল করা সম্ভব নয়। যেমন আপনাকে একটি মোবাইল ফোন দেওয়া হলো যেটার মধ্যে আধুনিক সকল সুবিধা আছে কিন্তু সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আপনি জানেন না, তাহলে কি সেই মোবাইলটি দিয়ে আপনি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন? তেমনি নামাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় এ থেকে কেউ কোনো উপকার লাভ করছে না, তবু আল্লাহ বলেছেন বিধায় পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অনেক মিথ্যা কথা নামাজের পক্ষে চালু হয়ে আছে যা কোর'আনেও নেই হাদিসেও নেই। যেমন- বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়- 'নামাজ জান্নাতের চাবি।' অথচ এই কথাটি সঠিক নয়, জান্নাতের চাবি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া জীবনের কোনো অঙ্গনে আর কারও বিধান মানি না এই সাক্ষ্য দেওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন- "জান্নাতের চাবি হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই" (মুয়াজ বিন জাবাল থেকে আহমদ, মেশকাত)

আরেকটি কথা ছোট কাল থেকে শুনে আসছি, বিশেষতঃ সমাজে একটি দল আছে যারা মানুষকে নামাজের দাওয়াত দেয়, তারা বলে, "এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ বিনা কারণে কাযা করলে এক হোব্বা বা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনে জ্বলতে হবে"। এই কথাটিও না আছে কোর'আনে, না আছে হাদিসে। ফাজায়েলে নামাজ নামক একটি গ্রন্থে এই কথাটি উল্লেখ আছে, সেখানে লেখক বলেছেন, 'হাদিসে আছে'। কিন্তু তিনি বলেন নি যে, কোন হাদিসে আছে। কোন এবারত, সনদ কিছু ছাড়াই একটি কথাকে হাদিস বলে চালিয়ে দেওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য? প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো হাদিস নয়, এটি তাদের মনগড়া কথা। এই মনগড়া কথাটি উপর্যুপরি প্রচারের ফলে মানুষের মনে গেঁথে গেছে যে, নামাজ পড়লেই জান্নাতে যাওয়া যাবে এবং না পড়লে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এই জন্য অনেকেই অন্য

কিছুর চিন্তা না করে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েই নিজেদেরকে পাক্কা মুমিন ও জান্নাতি মনে করেন।

সালাহ্ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরদ অর্থাৎ অবশ্যকরণীয়। কিন্তু সালাহ্, যাকাহ্, হজ্ব, সওম এমনকি জিহাদ পর্যন্ত ইসলামের সকল কাজের পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ্ (হুকুমদাতা) হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। এই লা-ইলাহা এল্লা আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা নাই অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদের ঘোষণা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই তওহীদ বর্তমানের ব্যক্তি জীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ জীবনের সর্ব অঙ্গনে যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য আছে সেখানে আর কারও কোনো হুকুম না মানা। আল্লাহর হুকুম মানেই হলো চূড়ান্ত সত্য ও ন্যায়। যে বা যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে নবী রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধকে তাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে তাদের আমল তিনি গ্রহণ করবেন, ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধ, গোনাহ মাফ করে তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র কোর'আনে ও সহীহ হাদিসে ছড়িয়ে আছে। এটাকে আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর রসুল তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা আবু যরকে (রা.) বললেন- যে লোক মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর তওহীদের ওপর অটল থাকবে সে ব্যভিচারী ও চোর হলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে (হাদিস- আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম)।

অতএব জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করছে তওহীদের উপরে; সালাহ্ করা আর না করার উপরে নয়। সালাহ্ কাদের জন্য তা আল্লাহ কোর'আনে ঘোষণা করেছেন, হে রসুল আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদেরকে তুমি বল সালাহ্ কায়েম করতে (সুরা-এব্রাহিম,আয়াত-৩১)। আর এই সালাহ্ হচ্ছে ঐ তওহীদ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাটি সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য যে চরিত্র দরকার সেই চরিত্র তৈরির প্রশিক্ষণ (Training)। এটা ইতিহাস যে, আল্লাহর রসুলের অনেক সাহাবী জীবনে এক ওয়াক্ত সালাহ্ কায়েম করার সুযোগ পাননি, রসুলের হাতে তওহীদের বায়াত গ্রহণ করেই জিহাদে, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে চলে গেছেন। নামাজ বা সালাহ্ যদি জান্নাতের চাবি হতো তাহলে আল্লাহর রসুল নবুয়ত পেয়েই মানুষকে বলতেন, 'তোমরা নামাজ পড়'; তাহলেই তোমরা জান্নাতি হবে আর নামাজ যদি না পড় তাহলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।' কিন্তু তিনি কি তাঁর জীবনে একবার ও এমন কথা বলেছেন? বলেন নি। এমন কি পবিত্র কোর'আনে এমন একটি আয়াত ও নেই যেখানে বলা হয়েছে, 'সালাহ্ কায়েম করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, আর না করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।' বরং জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করে তওহীদের উপরে।

উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য- মানবজীবন থেকে যাবতীয় অন্যায়, অশান্তি দূর করার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা। রসুলাল্লাহর ৬০/৭০ বছর পরে যখন জাতি সেই সংগ্রাম ত্যাগ করল, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে বহু জাল হাদিস উদ্ভাবন করা হয়। "নামাজ বেহেস্তের চাবি", "এক ওয়াক্ত নামাজ কাযা করলে এক হোব্বা বা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে"- তেমনই দুইটি বানোয়াট হাদিস। যে অসৎ উদ্দেশ্যে এই হাদিস উদ্ভাবন করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য শতভাগ সফল হয়েছে। যার প্রমাণ এই জনসংখ্যা এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সংগ্রামবিমুখ এবং তাদের কাছে ইসলাম মানেই নামাজ। তাদের আকিদায় এখন জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুমের কোনো অস্তিত্ব নেই, প্রয়োজনও নেই। আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করারও কোনো দরকার নেই। তাদের দরকার শুধু নামাজ আর নামাজ। কুফর ও শিরকের সাগরে নিমজ্জিত থেকে যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অসত্যের সঙ্গে আপস করেও তারা মনে করে যে শুধু নামাজ পড়েই তারা জান্নাতে চলে যাবেন।

সাবধান! আমার কথা থেকে কেউ যেন এটা মনে না করে যে, আমি সালাহ্কে খাটো করছি। পূর্বেই বলেছি যে, মহান আল্লাহ তাঁর কোর'আনে ৮০ বারেরও অধিক সালাহ্র কথা বলেছেন। যে সালাহ্ পবিত্র মেরাজে নিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে শিক্ষা দিলেন, যে সালাহ্ দৈনিক ৫ বার ফরদ সে সালাহ্কে কোনো মুমিন খাটো করে দেখতে পারে না। আমি বলতে চেয়েছি, নামাজ পড়ুন বুঝে-শুনে, আল্লাহ কেন সালাহ কায়েম করতে বলেছেন সেটা বুঝে পড়ুন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জেনে, না বুঝে কোনো আমল করবেন না, তাতে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। যেটা যে স্থানে থাকা দরকার সেটাকে সে স্থানে রাখাই ন্যায়সঙ্গত, অতিরঞ্জিত করা অন্যায়। তওহীদ ছাড়া সালাহ্র কোনো দামই নেই। নবী করিম (স:) মক্কার ১৩ বছর জীবনে শুধু তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১১তম বৎসরে পবিত্র মেরাজে গিয়ে রসুল (সা.) সালাহ্ আনলেন, এর মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিলেন অথবা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁরা তো শুধু তওহীদ নিয়েই জান্নাতে গেলেন। তাঁর নিকট প্রথমে কেউ আসলে তাকে শুধু তওহীদের দিকেই আহ্বান করতেন। যে তওহীদে আসবে তার জন্যেই সালাহ্। সালাহ্র কথা ৮০ বার কিন্তু তওহীদের কথা সহস্রবার বলা হয়েছে। পবিত্র কোর'আনে সবচাইতে আলোচিত বিষয় তওহীদ, সকল নবীর আনীত দীনের ভিত্তি এই তওহীদ। অথচ আজ সেই তওহীদ পৃথিবীর কোথাও নেই, মানবজাতি কার্যত কাফের ও মোশরেক হয়ে আছে, কিন্তু তা নিয়ে কারও কোনো চিন্তা নেই। তারা ভুলেই গেছে ইসলামের শুরু তওহীদ দিয়ে নামাজ বা সালাহ দিয়ে নয়।

[বি:দ্রঃ এই নিবন্ধে ফার্সি শব্দ নামাজ এর পরিবর্তে আরবি শব্দ সালাহ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'নামাজ' শব্দটি দিয়ে সালাহ এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।]